# ওয়ায-মাহফিল আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-নীতি

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

**ওয়ায মাহফিলের উদ্দেশ্য**

দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় দীনী ইলম শিক্ষা করা এবং দীনের সহীহ জযবা ও সুস্থ চেতনা ধারণ করা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের জন্য ফরযে আইন। ওয়ায মাহফিলের আয়োজন দ্বারা আসল উদ্দেশ্য হলো, দীনী কথা শুনে শুনে অন্তরে দীনের জযবা পয়দা করা এবং ইলমে দীন শিক্ষা করা। এজন্য প্রত্যেক এলাকায় সচেতন দীনদার ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে বৎসরে একাধিকবার ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা উচিত। তবে ওয়ায মাহফিল দ্বারা যেন শ্রোতাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, সেজন্য ওয়ায মাহফিল আয়োজনের সঠিক পদ্ধতিও জানা দরকার।

**ওয়ায়েয/বক্তা ও মেহমান নির্বাচন প্রসঙ্গ**

১. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. হাকীমুল উম্মতের বয়ানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন–

'তাঁর বয়ান শোনে শ্রোতাদের অন্তঃকরণ আলোকিত হতো, দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধি এবং দীনের সমঝ পয়দা হতো। হযরতের বয়ানের বিশেষ দিক এই ছিলো যে, তাতে হক-বাতিলের পার্থক্য, আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা, দীনের সঠিক ও সুস্থ চেতনা এমনভাবে সৃষ্টি হতো যে, নাস্তিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তির অন্তরও সত্যের আলোয় আলোকিত হতো। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কল্পনা-সন্দেহ থেকে মন-মস্তিষ্ক নিষ্কলুষ হয়ে যেতো। শয়তানের প্ররোচনার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। বর্ণনাশৈলীতে এতোটাই মুগ্ধতা ছিলো যে, শ্রোতাদের অন্তর আল্লাহর মহব্বতের সাগরে অবগাহন করে সিক্ত ও তৃপ্ত হতো। কবির এ বক্তব্যের যথার্থতা পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হতো–

از دل خیزد بر دل ریزد

'অন্তর থেকে নিঃসৃত হয়ে অন্তরে গিয়ে আঘাত করতো!'

কাজেই দীনী মাহফিলের বক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এমন হক্কানী আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামকে দাওয়াত দেয়া উচিত, যাদের বয়ানে কমবেশি উল্লিখিত গুণাবলী পাওয়া যায়।

২. দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে এমন বক্তাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত যারা ওয়াযের বিনিময় গ্রহণ করেন না। কারণ ওয়ায করা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের কাজ। আর এ কাজ দ্বারা তখনই উম্মতের ব্যাপক ফায়দা হয় যখন তা নবীগণের তরীকায় করা হয়। আর কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত আছে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ওয়াযের বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তাঁরা একমাত্র আল্লাহন কাছ থেকে বিনিময় পাওয়ার আশায় ওয়ায করতেন। (সূরা ইয়াসীন-২১, সূরা শু'আরা-১২৭)

৩. দীনের ব্যাপারে জাহেল ও অজ্ঞ লোককে বক্তা নির্বাচন করা জায়েয নেই; চাই সে যত সুন্দর ও সুরেলা বয়ানই করুক। এদেরকে বক্তা নির্বাচন করা কিয়ামতের আলামত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯, ১০০)

৪. অপরিচিত বা অজ্ঞাত বক্তা–যার ইলম ও আমল সম্পর্কে হক্কানী আলেম সমাজ অবগত নন– এমন কাউকে দাওয়াত না দেওয়া।

৫. বে-আমল আলেম এবং টেলিভিশনের বক্তাদেরকে মাহফিলের বক্তা নির্বাচন করা উচিত নয়। এদের দ্বারা জনগণের মধ্যে দীনের পরিবর্তে বদদীনী ও গোমরাহী সৃষ্টি হয়। (সূরা বাকারা-৪৪, মুসলিম শরীফ; হা.নং ১৪৫, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী হা.নং ৯০১৬, ৯০১৮)

৬. ওয়াযকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন বক্তাদেরকেও পারতপক্ষে দাওয়াত না দেয়া। একজন আলেম যখন ওয়াযকে তার জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে, তখন পেশাগত স্বার্থে তাকে এমন কিছু উপায় ও কৌশল গ্রহণ করতে হয়, যা ওয়াযের প্রভাব ও সুফল নষ্ট করে দেয়। যেমন: এ ধরণের বক্তাগণ সাধারণত চুক্তি করে টাকা নিয়ে থাকেন, যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সুন্নাত পরিপন্থী। তাছাড়া এ ধরণের বক্তাগণ শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করার জন্য বিষয়বস্তু, স্বর ও সুরে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা অবলম্বন করেন এবং ইনিয়ে বিনিয়ে হাস্যরস ও অভিনয় করে ওয়ায মাহফিলকে কৌতুকের মঞ্চ বানিয়ে ফেলেন। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে আসমানী ইলম শিক্ষা করবে যে, তা দ্বারা বিতর্ক করে আলেমদেরকে পরাজিত করবে, অথবা মূর্খদেরকে অবদমিত করবে, অথবা জনসাধারণকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযী শরীফ; হা.নং ২৬৫৪)

৭. যে সকল বক্তা শ্রোতাদেরকে মাজার-ওরস ইত্যাদি কেন্দ্রিক বিদ'আতী কর্মকাণ্ডের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং হক্কানী উলামায়ে কেরামের প্রতি জনসাধারণকে আস্থাহীন করার লক্ষ্যে উলামায়ে কেরামকে গালমন্দ করে তাদেরকে দাওয়াত না দেওয়া।

৮. হক্কানী উলামায়ে কেরামের মত ও পথ হতে বিচ্যুত কোনো ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী যথা: মাযহাব-বিরোধী, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনাকারী এদেরকে বক্তা হিসেবে দাওয়াত দেয়া যাবে না।

৯. প্রকাশ্য ফাসেক ও বে-আমল কোন লোককে মাহফিলের সভাপতি, পরিচালক কিংবা বিশেষ অতিথি বানাবে না। এতে খোদাদ্রোহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, ফাসেককে সম্মান জানালে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। (সহীহ বুখারী; হা. নং ৫৯)

১০. টাকা-পয়সা কালেকশনের জন্য কোনো বক্তাকে দাওয়াত না দেওয়া। মাহফিলের নামে বক্তা দিয়ে টাকা কালেকশন করানো উম্মতের সঙ্গে প্রতারণার শামিল!

**বয়ানের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গ**

১. ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. হযরত থানভী রহ.-এর বয়ানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন–

'হযরতের বয়ান অধ্যয়নের দ্বারা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট অবগতি হবে যে, কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বান্দার জন্য কী আদেশ-নিষেধ রয়েছে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্ম কেমন ছিলো? সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত কী ছিলো? মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও সুফিয়ায়ে কেরাম

কারা ছিলেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যই বা কী ছিলো? মাযহাবের ইমামগণের মতভেদ কী কারণে? ইসলামী দর্শন বলতে কী বুঝায়? নফস ও শয়তান মানুষের জীবনের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়? মুসলমানদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সঠিক কর্মপন্থা কী? দুনিয়াবী ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বিনোদন-ভ্রমণের ক্ষেত্রে ইসলামী রীতি-নীতি কী? জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের আবিষ্কার কী ছিলো? মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খানকাহগুলো কীভাবে মুসলমানদের জন্য হিদায়াত ও পথনির্দেশক হয়েছিলো? পারিবারিক ও সামাজিকভাবে একজন মুসলমানের জীবনধারা কেমন হওয়া উচিত? সামাজিক প্রথা ও বিদ'আত মুসলমানদের কতটা দীনী ক্ষতি সাধন করেছে? ইংরেজী শিক্ষা ও কৃষ্টি-কালচার দ্বারা মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্র কতটা বিষাক্ত হয়েছে..?' (মাআসিরে হাকীমুল উম্মত; পৃষ্ঠা ৩৩৪)

কাজেই হক্কানী এবং বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম দীনের জরুরী সকল বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনা করবেন। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকবেন। ওয়াযের মধ্যে ভিত্তিহীন কিসসা-কাহিনী বলে শ্রোতাদের হাসানো বা কাঁদানোর বদরসম থেকে বিরত থাকবেন। (মুসলিম শরীফ; হা.নং ৫০৫)

২. বয়ানের মধ্যে তারগীবী বা উৎসাহমূলক কথার সাথেসাথে যে পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা শরীয়তে ফরযে আইন (আকাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত, আখলাক) এগুলোর উপরও আলোচনা রাখবেন। এজন্য কোন মাহফিলে কয়েকজন ওয়ায়েয হলে তাদের মধ্যে ওয়াযের বিষয়বস্তু বণ্টন করে দেয়া ভালো। (সূরা বাকারা-১৭৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০, মুসলিম শরীফ; হা.নং ৯)

৩. মাহফিলের মধ্যে সুন্নাতের আলোচনা করবেন এবং নামাযসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বরং এটা মাহফিলের মূল উদ্দেশ্যও বটে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৭৭)

৪. মাহফিলের মধ্যে কোন হক্কানী পীর-মাশায়েখ শ্রোতাদেরকে যিকিরের মশক্ব করাতে চাইলে মাইক ছাড়াই করাবেন। মাইকে যিকির করা শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। তাছাড়া আজকাল হক্কানী পীর নয় এমন বক্তাও নিজের খেয়াল-খুশী মত যিকির করাতে থাকে, এটাও ঠিক নয়। (সূরা আ'রাফ-২০৫, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৯৪৯৫)

**প্রচলিত ওয়ায মাহফিলের বর্জনীয় বিষয়াদি**

১. যেহেতু দীর্ঘ সময়ব্যাপী কৃত ওয়ায সাধারণ মানুষ মনে রাখতে পারে না, এজন্য রাত ১০/১১টার মধ্যেই মাহফিল শেষ করা উচিত। আজকাল অনেক জায়গায় সারা রাত ওয়ায করার নিয়ম চালু হয়ে গেছে, এটা বন্ধ করা উচিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ ওয়ায করতে বলেছেন যতক্ষণ লোকদের আগ্রহ থাকে। আর সাধারণত মানুষের কমজোরীর কারণে সারা রাত আগ্রহ থাকে না। উপরন্তু দীর্ঘ রাতজাগা এ ওয়ায সকালে অধিকাংশ শ্রোতারই মনে থাকে না! (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩৩৭)

২. দূর-দূরান্ত পর্যন্ত না দিয়ে মাহফিলের মাইক-ব্যবস্থা প্যান্ডেলের সীমার মধ্যে রাখা আবশ্যক। যেন আগ্রহীরা প্যান্ডেলে চলে আসে এবং ব্যস্ত, অসুস্থ ও ইবাদতে মগ্ন ব্যক্তিদের কাজে, বিশ্রামে ও ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটে। হাদীস শরীফে কথা কিংবা কাজে ব্যস্ত লোকদেরকে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় দীনী নসীহত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এর দ্বারা সে বিরক্ত হবে এবং তার কাজে বিঘ্ন ঘটবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩৩৭)

৩. ওয়ায মাহফিলের ইশার জামা'আত স্থানীয় মসজিদসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী আদায় করে নিতে হবে। আগে-পরে করা হলে মাইকের আওয়াযে আশপাশের মসজিদগুলোর জামা'আতের সমস্যা হয় এবং মাহফিলে উপস্থিত মুসল্লীগণ ইশার জামা'আতের ব্যাপারে পেরেশান হয়। অনেক স্থানে দীর্ঘ রাতব্যাপী ওয়ায হওয়ার পর ইশার নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া হয়, এটা অবশ্য-পরিত্যাজ্য। (সূরা নিসা-১০৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২৪৫)

৪. মানুষকে ওয়ায মাহফিলের দাওয়াত দিয়ে তাদের থেকে চাঁদা কালেকশন করবে না। কারণ প্রচারপত্রে ওয়ায শোনানোর ঘোষণা বা ওয়াদা করা হয়। চাঁদার প্রয়োজন হলে স্থানীয় জনসাধারণকে ডেকে পরামর্শসভা করবে এবং সাহায্যের আবেদন করবে। (সূরা বাকারা-৪০)

৫. ওয়াযের শেষে গণদাওয়াত ও শিরনী -তবারকের নামে কোন কিছু বিতরণের ব্যবস্থা করবে না। এতে শ্রোতাদের মনোযোগ ওয়াযের দিকে না থেকে খানার দিকে থাকে। সে ক্ষেত্রে বয়ানের দ্বারা তেমন কোন উপকার পরিলক্ষিত হয় না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৭১৮, রদ্দুল মুহতার ২/১৪০)

৬. ওয়ায মাহফিল জমানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করাবে না। কারণ মাহফিল জমানোর জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। এর পরিবর্তে গানের সুরে নয় এমন হামদ-নাত ও ভালো অর্থবোধক গজল পরিবেশন করতে পারবে বা তালিবে ইলমদের দ্বারা তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রদর্শনী করাতে পারবে।

হ্যাঁ, নিয়মতান্ত্রিক বয়ান ও ওয়ায শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে খায়ের ও বরকতের জন্য কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা শুরু করবে। এ সময় সকলেই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিবে ও তিলাওয়াতের আদবের দিকে লক্ষ্য রেখে শুনবে। (আলমগীরী ৫/৩১৫, রদ্দুল মুহতার ১/৫১৮)

৭. চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে মাহফিল করবে না। এতে পথচারীদের কষ্ট দেয়া হয়, যা শরীয়ত-বিরোধী কাজ। সুতরাং মসজিদ-মাদরাসা বা কোন মাঠে-ময়দানে মাহফিলের ব্যবস্থা করবে। (যিকর ও ফিকর: ১৪৩)

৮. মাহফিলের রাস্তায় কোন গেট বা তোরণ বানাবে না। রঙ-বেরঙের পতাকা লাগাবে না। নিছক বিলাসিতা ও শৌখিনতার জন্য রঙ-বেরঙের বাহারি বাতি জ্বালানো বা তোরণ নির্মাণ করার দ্বারা ধর্মীয় গাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়। এগুলোর আয়োজন অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উপরন্তু তা অপচয়ের শামিল। আর বিজাতীয় অনুকরণ ও অপচয় সম্পূর্ণ হারাম! (সূরা বনী ইসরাঈল-২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৪২৫, যিকর ও ফিকর: ২৫)

৯. অনেক বক্তা নিজের চা পানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য শ্রোতাদেরকে যিকির-দুরূদে লাগিয়ে দেন এবং এই সুযোগে চা ইত্যাদি পান করেন। এটা দৃষ্টিকটু কাজ। দীনী উদ্দেশ্যবিহীন এভাবে দুরূদ পড়াও নিষেধ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী ১১/১৬৭)

১০. মাহফিলের ছবি তুলবে না এবং ভিডিও করবে না। অন্য কাউকে করতেও দিবে না; বরং সকলকে নিষেধ করবে। এতে দীনী মাহফিলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বরবাদ হয়ে যায় এবং বদদীনী ও গোমরাহী কায়েম হয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫০, সহীহ মুসলিম হা.নং ২১০৯)

১১. মাহফিলের প্রচারপত্র যথা: পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদিতে দিন,

তারিখ ও স্থান উল্লেখ করবে। বক্তাদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। লোকদেরকে ব্যক্তির আকর্ষণে সমবেত করবে না; দীনের আকর্ষণে সমবেত করবে। ব্যক্তি তো চিরকাল থাকে না। এমনকি (আল্লাহ না করুন) অনেক বড় ব্যক্তিও হকের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার অনুসারীরাও বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে! আল্লাহ হেফাযত করুন। আমীন! (আল-হিলয়া লি-আবি নুআইম ১/৩০৫-৩০৬)

১২. কোন বক্তার আগমনে নারায়ে তাকবীর বা অন্য কোন শ্লোগান দিবে না। এটা সুন্নতের খেলাফ। বিশেষ করে ওয়াযের মধ্যে কোন বক্তার আগমনে চলমান বক্তার বয়ান বন্ধ করে কোন বক্তার নামে শ্লোগান দিবে না। কুরআন-সুন্নাহর আলোচনার মর্যাদা অনেক উঁচু। কারো আগমনে তা বন্ধ করার অবকাশ নেই। কোন বক্তার ব্যাপারে 'প্রধান আকর্ষণ', 'জলসার মধ্যমণি' ইত্যাদি বলে অন্যান্য মেহমানদেরকে হেয় করবে না। কারণ সকলেই হক্কানী আলেম ও সম্মানিত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী ১১/১৬৭)

১৩. যেসব রাস্তায় সিএনজি অটোরিকশার মতো যানবাহন চলে, এর আশপাশে কোন মাহফিল হলে দেখা যায়, মাহফিলের আয়োজকরা ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী প্রতিটি যানবাহনকে আটকে দেয় এবং মাহফিলের জন্যে টাকা আদায় করে। অনেক সময় টাকা না দেয়া পর্যন্ত গাড়িটিকে ছাড়া হয় না। অথচ কারও কাছ থেকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপাচাপি করে টাকা আদায় করা এবং সেই টাকা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম! (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০৬৯৫)

১৪. মাহফিলের মহিলা-প্যান্ডেলে প্রজেক্টর স্থাপন করে মহিলা শ্রোতাদের জন্য বক্তাকে সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করা খুবই আপত্তিকর একটি ত্রুটি।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেন–

একদা আমি ও মাইমুনা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন সেখানে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা তার থেকে আড়ালে চলে যাও।' আমরা নিবেদন করলাম, ইনি তো অন্ধ। অর্থাৎ আমাদেরকে দেখবে না, চিনবে না তাহলে আমরা আড়ালে যাবো কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরাও কি অন্ধ হয়ে গেলে নাকি! অর্থাৎ সে তোমাদেরকে দেখছে না ঠিক কিন্তু তোমরা তো তাকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছো।' (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪১১৪)

এ হাদীস প্রমাণ করছে, পুরুষদের জন্য যেমন বিনা প্রয়োজনে পরনারীকে দেখার অনুমতি নেই, তেমন নারীদের জন্যও পর-পুরুষকে দেখার অনুমতি নেই ।

**ওয়ায মাহফিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গ**

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দীনের জরুরী ইলম শিক্ষা করা মহিলাদের উপরও ফরয। তবে এর শরীয়সম্মত পদ্ধতি হলো– পুরুষ লোকেরা দীন শিখে এসে মাহরাম মহিলাদেরকে দীন শেখাবে। অতঃপর এই শিক্ষিত মাহরাম মহিলারা ঘরের অন্যান্য মহিলাদেরকে, অনুরূপভাবে আশপাশের মহিলাদেরকে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ শেখাবে, প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসাইল শেখাবে, হক্কানী উলামায়ে কেরামের রচিত কিতাব থেকে ওয়ায-নসীহত পড়ে পড়ে শোনাবে। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে মাহরাম পুরুষের তত্ত্বাবধানে হক্কানী আলেম ও বুযুর্গদেরকে ঘরোয়া পরিবেশে এনে পর্দা-পুশিদার সাথে ওয়ায-নসীহতের ব্যবস্থা করবে।

একবার কতিপয় মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মজলিসে পুরুষদের সঙ্গে বসতে পারি না, আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন, যাতে সেই দিনে আমরা আপনার কাছ থেকে নসীহত শুনতে পারি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, موعدكن بيت فلانة অর্থাৎ নির্ধারিত দিন অমুক মহিলার ঘরে জমায়েত হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়ে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত করলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১০১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা.নং ২৯৪১)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত শ্রেষ্ঠতম ইমামের পেছনে নামায আদায়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মসজিদে নববীর জামাআতে অংশগ্রহণ করতো। তবে এর জন্য বেশ কিছু শর্ত ছিল। যেমন: ১. পূর্ণ পর্দার সাথে আসতে হবে।

২. সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না।

৩. সাজসজ্জা পরিত্যাগ করতে হবে।

৪. রাতে আসবে, দিনে আসবে না।

৫. মহিলারা সবার পরে আসবে এবং নামায শেষে পুরুষদের আগে বের হয়ে যাবে।

৬. কোনো অবস্থাতেই পুরুষদের সাথে মেলা-মেশার আশঙ্কা না থাকতে হবে। অতঃপর একসময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হায়াতেই মহিলাদেরকে মসজিদে নববীতে না এসে নিজের ঘরের অন্দরমহলে নামায পড়ার জন্য তাকীদ করতেন। যেমন, একদা হযরত উম্মে হুমাইদ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি, তুমি আমার পেছনে নামায পড়তে ভালোবাসো। কিন্তু তোমার ঘরের একান্ত কামরায় আদায়কৃত নামায তোমার বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায তোমার বাড়ীতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়ীতে নামায তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উক্ত মহিলা নিজ ঘরের একান্ত কামরায় নামাযের স্থান নির্ধারণ করে নিলেন এবং আমরণ তাতেই নামায আদায় করলেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭০৯০, সহীহ ইবনে খুযাইমা; হা.নং ১৬৮৯, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ২২১৭)

অতঃপর নবীজীর ইন্তিকালের পর সামাজিক পরিবেশের সামান্য পরিবর্তনের কারণে অনেক সাহাবী মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দেন এবং মহিলারাও মসজিদে আসা বন্ধ করে দেন। নবীজীর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের তাকওয়া-তাহারাত ও খোদাভীতি, যা কিনা প্রবাদতুল্য এবং পরবর্তী যুগের মহিলাদের জন্য আদর্শ– তাঁদের ব্যাপারে যদি মসজিদে গমন নিষেধ হয়, তাহলে এমন ফেতনা-ফাসাদের ব্যাপকতার যুগে প্রকাশ্যে দিবালোকে বেপর্দার সাথে দূর-দূরান্ত থেকে মহিলাদের ওয়ায-মাহফিলে যাতায়াত কীভাবে অনুমোদিত হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে দীনী মাহফিল করার তাওফীক দান করুন এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

# জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

## ১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

(ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য)

| তারিখ | কার্যক্রম |
|---|---|
| ৭ শাওয়াল | মাদরাসা খোলা, সকল জামাআতের ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের ভর্তিফরম সংগ্রহ, তাইসীর থেকে নাহবেমীর পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (মৌখিক) ও ভর্তি। |
| ৮ শাওয়াল | হিদায়াতুন্নাহব থেকে তাখাস্‌সুস পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক)। |
| ৯ শাওয়াল | ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি (পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ঐ দিন ভর্তি হওয়া লাযেম, পরে সুযোগ থাকবে না)। |
| ১০ শাওয়াল | মকতব, নাযেরা ও হিফয বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা ও ভর্তি। |

## প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও শর্তাবলী

১. ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু নতুন/পুরাতন সকল ছাত্রের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র এবং পাসপোর্ট সাইজ ২কপি ছবি লাগবে। ২. নতুন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষায় কোন একটি প্রশ্নের উত্তর উর্দূতে দিতে হবে।

## পরীক্ষার বিষয়

| ক্র. | জামা'আত | বিষয় |
|---|---|---|
| ০১ | তাফসীরুল কুরআন বিভাগ | জালালাইন, আল-ফাউযুল কাবীর |
| ০২ | উলূমুল হাদীস বিভাগ | বুখারী ১ম, শরহু নুখবাতিল ফিকার |
| ০৩ | আদব বিভাগ | আরবী কাওয়াইদ, ইবারত পাঠ, লেখালেখি ও অনুবাদের যোগ্যতা ও আধুনিক আরবীর সাথে সম্পৃক্তি |
| ০৪ | তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) | মিশকাত, হিদায়া ৪র্থ |
| ০৫ | নিহায়ী সানী (মিশকাত) | জালালাইন, হিদায়া ১ম ও ২য় |
| ০৬ | নিহায়ী আউয়াল (জালালাইন) | শরহেবেকায়া, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ) |
| ০৭ | সানাবী সানী (শরহেবেকায়া) | শরহেজামী, কানযুদ্দাকাইক |
| ০৮ | সানাবী আউয়াল (শরহেজামী) | কাফিয়া, কুদূরী |
| ০৯ | উস্তানী সালিস (কাফিয়া) | হিদায়াতুন্নাহব, ইলমুস সীগাহ |
| ১০ | উস্তানী সানী (হিদায়াতুন্নাহু) | নাহবেমীর, ইলমুস সরফ ৩য় ও ৪র্থ/পাঞ্জেগাঞ্জ |
| ১১ | উস্তানী আউয়াল (নাহবেমীর) | মীযান মুনশাইব/ইলমুস সরফ ১ম ও ২য়, আরবী আদব |
| ১২ | ইবতিদায়ী সানী (মীযান) | তাইসীর, ফারসী কী পেহলী কিতাব |
| ১৩ | ইবতিদায়ী আউয়াল (তাইসীর) | উর্দূ কায়িদা, নাযিরা (গাইরে হাফেযদের জন্য) |

**বি.দ্র. উল্লিখিত জামাআতগুলোর লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে মতনখানীও পরীক্ষা হবে।**

## আত-তাখাস্‌সুস ফিল-ফিক্‌হি ওয়াল-ইফতা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

১. আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি ফরম ২৪ রমযান ১৪৪১ হিজরীর আগেই সংগ্রহ করতে হবে।

২. শুধুমাত্র জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা'র ফাযেলগণ ফরম সংগ্রহ করবেন। অবশ্য রাহমানিয়ার কোন দায়িত্বশীল উস্তাযের সুপারিশ ও যিম্মাদারীর শর্তে অন্য প্রতিষ্ঠানের ফাযেলও ফরম সংগ্রহের সুযোগ পাবেন।

৩. দাওরায়ে হাদীস/তাকমীল জামা'আতে ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষার গড় নম্বর ৬৯-এর উর্ধ্বে থাকতে হবে এবং নম্বরপত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দফতর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৪. লিখিত ও মৌখিক দুই পর্বে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা ২৫ রমাযান বাদ যোহর ও মৌখিক পরীক্ষা ২৬ রমাযান বাদ যোহর নেয়া হবে। মৌখিক পরীক্ষায় সুযোগ প্রাপ্তদের তালিকা ২৬ রমাযান সকাল ১১টায় প্রকাশ করা হবে।

৫. সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, হিদায়া ৩য় খণ্ড, নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কিছু জরুরী পরীক্ষা নেয়া হবে।

৬. লিখিত পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষার সুযোগ পাবে এবং উভয় পরীক্ষায় গড়ে ন্যূনতম ৬৫ নম্বরে উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম ১৫ জন ভর্তির সুযোগ পাবেন।

৭. ২৭ রমাযান সকাল ১১টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং রমাযানের মধ্যেই ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাবে।

**-শিক্ষা দফতর, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭**

# ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভারসাম্য রেখে বড়দের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রাখুন

## আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী দা.বা.

হামদ ও সালাতের পর...
আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আজকের এই বার্ষিক ফুযালা সম্মেলনে আবনায়ে রাহমানিয়াকে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। আপনাদেরকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া নামে আসাতিযা ও তালিবে ইলমদের মাঝে যে সম্পর্ক ও বন্ধন তৈরি হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের জানা আছে, আমি বয়ান-বক্তৃতার লোক নই। তা সত্ত্বেও আপনাদের সঙ্গে রবত-যবতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আপনাদের সামনে বসি এবং দু'-চার কথা বলে আনন্দ লাভ করি।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সবচেয়ে বড় নেয়ামত উলূমে নববীর ধারক-বাহক বানিয়েছেন। এজন্য আপনাদের দায়িত্ব-কর্তব্যও অনেক বেশী। আমাদের কাছে আপনারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু কাটিয়ে গেছেন। আমাদের সাধ্যের কমতি থাকা সত্ত্বেও আমরা আপনাদেরকে আকাবিরের চিন্তা-চেতনার ধারক বানাতে চেষ্টা করেছি। সেই চিন্তা-চেতনা নবায়ন করার জন্যই বছরে অন্তত একবার আপনাদেরকে স্মরণ করি। আর আপনারাও আলহামদুলিল্লাহ সাড়া দিয়ে হাজির হয়ে যান। কিন্তু অল্পকিছু তালিবে ইলম কেন যেন রাবেতার এ সম্পর্ক থেকে দূরে-দূরে থাকতে চায়। দেখা যাচ্ছে, এভাবে নিজেকে দূরে রাখতে রাখতে একসময় তারা দূরেই চলে গেছে। তাদের জন্য দুঃখ হয়, আফসোস হয়, কষ্ট অনুভব করি।

বাস্তবতা হল, আমাদের উপর নিয়াবাতে নববীর যে সুমহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, মুরুব্বীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, আকাবিরীনের উসূল অনুযায়ী চলা এবং তাদের আদর্শ গ্রহণ করার দ্বারা তা পালন করা সহজ ও নিরাপদ হবে। শুধু মেধা ও যোগ্যতা বলে ওয়ারাসায়ে আম্বিয়ার দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম কখনোই সম্ভব নয়। আকাবির, আসাতিযায়ে কেরাম ও বড়দের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যখন নিবিড় হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। পক্ষান্তরে আমরা যখন মনে করবো, আমাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা যোগ্যতা দিয়েছেন, আমরা তো অনেক বিষয় উস্তাদদের চেয়েও ভালো বুঝি, তাহলে এটি হবে বিচ্যুতি ও বিচ্ছিন্নতার কারণ– বিশেষত বর্তমানের ফিতনার যামানায়।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ দীন আমাদের কাছে আমানত। আমাদের পক্ষে এই আমানতের হক যথাযথ আদায় করা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা দুনিয়ার পদ-পদবী ও অর্থ-বিত্তের লালসা ত্যাগ করবো এবং ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান লোকদের থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখবো। আমাদের আকাবিরগণ এক্ষেত্রে এই পন্থাই অবলম্বন করে গেছেন। কিন্তু এই ফিতনার যামানায় উল্টোটাই ঘটছে অহরহ। এমনকি আমরা যাদেরকে বড় মনে করছি তাদেরও কেউ কেউ বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। ইসলাম-বিদ্বেষী, দুনিয়াদার ও ক্ষমতাবানেরা নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য কখনো আমাদেরকে কোথাও আহ্বান করলে কেন যেন আমরা মাতালের মত ছুটে যাই। আমরা আশা করি, রাহমানিয়ার ফাযেলগণ সমস্ত বিত্তশালী ও ক্ষমতাদর্পীদের থেকে বেনিয়ায হয়ে সর্বদা হকের উপর অটল ও অবিচল থাকবে। বিভিন্ন দিক থেকে চাকচিক্যময় নানারকম দাওয়াত আসবে কিন্তু আমরা আশা করবো, রাহমানিয়ার ফাযেলগণ সেগুলোর মোহে না পড়ে নিজেদেরকে আকাবির ও আসলাফের আদর্শের উপর পূর্ণ অবিচল রাখবে, দুনিয়াবী স্বার্থের সামনে তারা কখনো আত্মসমর্পণ করবে না। আলহামদুলিল্লাহ! এ ব্যাপারে আবনায়ে রাহমানিয়ার প্রতি আমরা আশাবাদী, নিরাশ নই।

বর্তমানে আকাবিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের নিকটঅতীতের দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরীন, যাদের হাওয়ালা দিয়ে আমরা কথা বলে থাকি, তাদের থেকেও দূরে সরানোর জন্য, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। এমনকি তাদের ভাষার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্যও অপপ্রয়াস চলছে। সময় নষ্ট, মেধা নষ্ট ইত্যাদি বুলি আওড়ে উর্দূ ভাষায় রচিত ইলমের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে কওমী তালিবে ইলমদেরকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে।

বলা হয়, কওমী তালাবাদের মাতৃভাষায় পারদর্শী হতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই হতে হবে এবং কে তা অস্বীকার করেছে। কিন্তু এর জন্য ইলমে ওহী অর্জনের মাধ্যমও কি 'মাতৃভাষা' হওয়া জরুরী? মাতৃভাষায় কুরআন-হাদীস চর্চা করলেই কি মাতৃভাষায় পারদর্শী হওয়া যায়? কিছুতেই নয়; বরং এর জন্য আলাদা মেহনত প্রয়োজন হয়।

আমরা দেখেছি, কিছু তালিবে ইলম সাহিত্যচর্চার নামে যা-তা করে বেড়ায়, পড়াশোনা বাদ দিয়ে যার-তার মজমায় হাজির হয়। অথচ ইলমের ময়দানে সে রিক্তহস্ত।

মোটকথা বিভিন্ন হুযুগ উঠিয়ে আমাদেরকে আকাবিরের ইলম থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা ছলছে। আজকে এখানে এক মেহমান উর্দূতে বয়ান করেছেন। আপনারা রাহমানিয়ার ছাত্র হওয়ায় সরাসরি এর তরজমা, আবেদন ও গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এখন এমনও অনেক মাদরাসা রয়েছে যেখানে দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের জন্যও উর্দূ বয়ান অনুবাদ করতে হয়। আমার মতে, এটাও সেই ষড়যন্ত্রের কুফল।

বিশেষ ফায়দা হাসিলের জন্য কওমী মাদরাসাগুলো কোন সম্মিলিত তানযীম বা প্লাটফর্মের অধীনে থাকবে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী একটি বিষয়। এর জন্য বেফাকই যথেষ্ট ছিল; ব্যক্তিগত নেতৃত্বের স্বার্থে আলাদা আলাদা প্লাটফর্ম গঠনের কোন প্রয়োজন ছিল না। সম্মিলিত প্লাটফর্ম থেকে হলে বাতিলের মোকাবেলার জন্য একটি আওয়াজই যথেষ্ট। আমরা দেখেছি, এক আমিনী সাহেব রহ.-এর হুংকারে বাতিল কীভাবে থরথর করে কেঁপে উঠতো! অথচ আজ পৃথক পৃথক তানযীমের হাজারো চিৎকার বাতিলকে তেমন প্রভাবিত করতে পারছে না।

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# দীন-অনুরাগী সর্বসাধারণ ও তরুণ উলামায়ে কেরামের প্রতি কিছু কথা

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মানিকগঞ্জী দা.বা.

ব্যক্তিগতভাবে দীন পালনের জন্য হোক কিংবা অপরের কাছে দীন পৌঁছে দেয়ার জন্য হোক– দীনের যে কোন শাখা-প্রশাখার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ও সম্পৃক্ত করতে পারা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সংযুক্তি ও সম্পৃক্তি একদিকে যেমন সাআদাত ও সৌভাগ্যের, অপরদিকে এটি অতি সংবেদনশীল ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এ ক্ষেত্রে খুব সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হয় এবং ততোধিক সতর্কতার সঙ্গে পথ বাছাই করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে– বিশেষত পথ বাছাইয়ের বেলায়– সামান্য ভুল হলেও পথবিচ্যুত এবং বিভ্রান্ত হওয়ার সমূহ আশংকা থাকে।

**দীন মেনে চলার জন্য নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ রাহবারের দিকনির্দেশনা আবশ্যক**

বর্তমানকালে দীনের প্রতি মানুষের আগ্রহ-অনুরাগ লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে। বিশেষত উম্মতের তরুণ প্রজন্ম দীনের প্রতি অধিকহারে মনোযোগী হচ্ছে। দীনের প্রতি জনসাধারণের এই আগ্রহ ও মনোসংযোগ খুবই ভালো লক্ষণ এবং প্রশংসার দাবীদার।

দীন-অনুরাগী এসব জনসাধারণ দীন শেখার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছে। কেউ দাওয়াত ও তাবলীগে সময় লাগাচ্ছে। কেউ হক্কানী পীর-মাশায়েখের সোহবতে যাচ্ছে। কেউ হক্কানী উলামায়ে কেরামের ওয়াজ-মাহফিল শুনছে। আবার কেউ নির্ভরযোগ্য আলেমদের কিতাবাদি পড়ছে। দীন শেখার এই পন্থাগুলো হক্কানী ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের তত্ত্বাবধানে হলে বেশ নিরাপদ।

অপরদিকে দীনের প্রতি আগ্রহীদের বড় একটা অংশ বিশেষত তরুণ প্রজন্ম দীন শেখার জন্য আধুনিক মিডিয়ার দ্বারস্থ হচ্ছে। এরা টেলিভিশন, ফেসবুক, ইউটিউবসহ ইন্টারনেট-সংশ্লিষ্ট আধুনিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সাধারণ মানুষ– চাই জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, যারা দীনী বিষয়ের ভালো-মন্দ ও ভুল-শুদ্ধের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম নন– তাদের জন্য এ পন্থা বড়ই নাযুক ও স্পর্শকাতর।

ইন্টারনেট ও আধুনিক মিডিয়া সম্পর্কে যারা ধারণা রাখেন তাদের মতে– আধুনিক মিডিয়া, বিশেষত ইন্টারনেট, এক কূল-কিনারাহীন গভীর জলাশয়ের মতো। এখানে প্রতিনিয়ত লক্ষ-কোটি মানুষ তাদের চিন্তা ও মতামত নিজেদের মতো করে পেশ করে। এখানে ভালো-মন্দ, পাক-নাপাক সবকিছুই লাগামহীন প্রদর্শিত হয় এবং যুগের পর যুগ সংরক্ষিত থাকে।

ইন্টারনেটের যথার্থ উদাহরণ ঢাকার কোলঘেঁষে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গা নদী। শহরের সমস্ত গান্দা ও নাপাকী বুড়িগঙ্গায় পতিত হয়ে ব্যবহারযোগ্য পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই গান্দা ও নাপাকীর মিশ্রণ বর্তমানে এতোটাই প্রবল যে, নদীর সমস্ত পানি তার ব্যবহারযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ নাপাকীর রঙ-গন্ধ-স্বাদে নদীর পানি একাকার হয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটের দূষণ বুড়িগঙ্গার চেয়েও ভয়াবহ। কেননা, বর্ষাকালে পবিত্র পানির প্রবল স্রোত বুড়িগঙ্গার গান্দা-গলীয ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে দু-চার মাসের জন্য পানি তখন ব্যবহারযোগ্য থাকে। কিন্তু যে নাপাক চিন্তা একবার ইন্টারনেটে প্রবেশ করে, সেটা আর কখনও নিষ্কাষিত হয় না। সেই নাপাকীর উপর আরও নাপাকী জমতে থাকে। এভাবে প্রতিনিয়ত ইন্টারনেটের দূষণমাত্রা বেড়েই চলছে। সুতরাং ভালো ও মন্দে এবং পাক ও নাপাকে যারা পার্থক্য করতে সক্ষম নন, তাদের জন্য ইন্টারনেট থেকে বিশুদ্ধ দীন শিক্ষা করা আকাশ-কুসুম কল্পনা!

অধিকন্তু মুসলিম উম্মাহকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিজাতীদের একটা বড় দল সপ্তাহের চব্বিশ ঘণ্টা পরিকল্পিতভাবে ইন্টারনেটে ব্যস্ত রয়েছে। যেসব কাজ তারা নিজেরা করতে পারে না, তার জন্য তারা কিছু মুসলিম নামধারী এজেন্ট তৈরি করে। অতঃপর এই এজেন্টরা জনসাধারণের কাছে নিজেদেরকে বিখ্যাত সব দীনী প্রতিষ্ঠানের ফাযেল, স্কলার ও পিএইচডি-ধারী পরিচয় দেয় এবং দাবীকৃত সেসব প্রতিষ্ঠানের লেবাস ও ইউনিফর্ম ধারণ করে। প্রথমদিকে তারা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদি এড়িয়ে সর্বসম্মত দীনী বিষয়াদি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থান করে। অতঃপর যখন তাদের একদল বিশাল ভক্তবৃন্দ জুটে যায় তখন বিভিন্ন ভালো কথার আড়ালে তুলে ধরে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও নাপাক চিন্তাধারা। স্বাভাবিকভাবেই হক্কানী উলামায়ে কেরাম সত্য প্রকাশের খাতিরে এসব নামধারী 'আল্লামা', 'শায়খ' ও 'ডক্টর'দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কিন্তু বেসামাল ভক্তবৃন্দ তখন আর ওই শায়খ-আল্লামা-ডক্টরদের ছাড়তে পারে না। উল্টো হিতাকাঙ্ক্ষী উলামায়ে কেরামকে হিংসুক, পশ্চাদপদ, কূপমণ্ডূক ইত্যাদি বিশেষণে অভিযুক্ত করে এবং শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে!

ইন্টারনেটপ্রিয় এসব ভাইদের বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে সীরীন রাহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ রাখা দরকার। তিনি বলেছেন,

إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم

(অর্থ:) মনে রেখো! এই যে ইলম, এটাই তোমাদের দীন-ধর্ম। সুতরাং কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দীন-ধর্ম হাসিল করছো– এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থেকো। (মুকাদ্দিমা সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫)

দীনপ্রিয় সর্বসাধারণকে একথাও মনে রাখতে হবে, দীনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামই আমাদের আমলী নমুনা। সে হিসেবে দীন অর্জনের ক্ষেত্রেও তারা আমাদের নমুনা। সাহাবায়ে কেরাম দীন শিখেছেন প্রথমত নবীজীর সোহবতে গিয়ে, অতঃপর মুরুব্বী সাহাবায়ে কেরামের সান্নিধ্যে গিয়ে। সোহবত বা সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে দীন অর্জন করেছেন বলেই তাদেরকে সাহাবী বা 'সোহবতধন্য' বলা হয়। এখন সাহাবায়ে কেরাম আমাদের মাঝে নেই। তবে তাদের সীরাত ও জীবনাদর্শ কিতাবাকারে বিদ্যমান। কিন্তু আমরা সর্বসাধারণ যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আরবী ভাষা শিখিনি, এজন্য সরাসরি সাহাবীদের কর্মপদ্ধতি জানা এবং সঠিকভাবে বোঝা আমাদের একার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অনূদিত কিতাবাদি পড়েও এটা সম্ভব নয়। কেননা

অনুবাদকের যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতেই কোন অনুবাদ সঠিক বা ভুল সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া বইপত্রে ছাপার ভুল থাকা তো একেবারেই সাধারণ বিষয়। সুতরাং সর্বসাধারণের জন্য সমকালীন দীনী মুরুব্বী তথা হক্কানী উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে গিয়ে দীন শেখার বিকল্প নেই। কারণ হক্কানী উলামায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের আমল ও কর্মধারা সম্পর্কে নির্ভুলভাবে অবগত। উপরন্তু তারা নিজেরাও দীন বোঝা ও দীন পালনের ক্ষেত্রে দূর ও নিকট অতীতের মুরুব্বীদেরকে মেনে চলেন। আর এটাও করেন এ কারণে যে, দূর ও নিকট অতীতের মুরুব্বীগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

সোহবত বা সান্নিধ্যে গিয়ে দীন শেখার বড় ফায়দা হলো– বক্তা বা শিক্ষকের আমল-আখলাক স্বচক্ষে দেখে তার চারিত্রিক পরিশুদ্ধি অনুমান করা যায় এবং বক্তব্য ও আলোচনা শুনে তার ইলমের গভীরতা নিরূপণ করা যায়। আর যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য ব্যক্তির ইলমী গভীরতা ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে ইন্টারনেটে হাজারবার ভিডিও দেখেও বক্তার আমলী জীবন সম্পর্কে কিংবা কারও লেখা পড়েই লেখকের লেবাস-সূরত, গঠন-আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়; বক্তার বা লেখকের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন তো আরও জটিল ব্যাপার। অথচ শ্রোতা ও পাঠকের জীবনে দীনী পরিবর্তন আসার জন্য বক্তা ও লেখকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সারকথা, সর্বসাধারণের জন্য চেনাজানা আল্লাহওয়ালা হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী দীন শেখা এবং দীন পালন করা জরুরী। এটাই তাদের জন্য সর্বাধিক নিরাপদ পন্থা। আধুনিক মিডিয়া, বিশেষত টেলিভিশন ও ইন্টারনেটনির্ভর অন্যান্য উপায়-উপকরণ কিছুতেই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা দীন-অনুরাগী সর্বসাধারণকে সঠিক পন্থায় দীন শেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**দীনের খিদমত বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য সমকালীন দীনী মুরুব্বীদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান জরুরী**

দীনের দাওয়াত, তা'লীম ও তাবলীগ যে অতীব মর্যাদাপূর্ণ এবং সদকায়ে জারিয়ার অন্যতম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত আছেন। তবে মর্যাদাপূর্ণ এ খিদমতগুলো যথাযোগ্য মর্যাদা ও সঠিক উপলব্ধির সাথে হওয়া উচিত। যোগ্য ব্যক্তিদেরই এ কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। যার যতোটুকু যোগ্যতা আছে খিদমত ততোটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। দীনের যে বিষয়ে যিনি যোগ্য নন, সে বিষয়ে তার কথা না বলা উচিত।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মা-উনযিলা' অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিষয়াদির তাবলীগ করতে বলেছেন। অপরদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে তাঁর পক্ষ হতে প্রাপ্ত 'আয়াত' তথা সুন্নাহর তাবলীগ করতে বলেছেন। সুতরাং তাবলীগ, তা'লীম ও দাওয়াত হবে 'মা-উনযিলা' এবং 'আয়াত'-এর। সহজ কথায় কুরআন ও সুন্নাহর। আর জানা কথা যে, 'মা-উনযিলা' ও 'আয়াত'-এর দাওয়াত দিতে হলে সর্বপ্রথম স্বয়ং মুবাল্লিগকে, অনুরূপভাবে দাঈ ও মুআল্লিমকে 'মা-উনযিলা' ও 'আয়াত' সম্পর্কে যথাযথ অবগতি লাভ করতে হবে।

মোটকথা, যিনি কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন, তিনি দাওয়াত, তালীম ও তাবলীগের খিদমত তো অবশ্যই আঞ্জাম দিবেন, কিন্তু ততোটুকু দিবেন যতোটুকু তার শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে জানা আছে। যা জানা নেই, কিংবা স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে জানা নেই সে ব্যাপারে তিনি অগ্রসর হবেন না।

এ ব্যাপারে আজকাল ব্যাপক অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেখা যায়, প্রফেসর সাহেবগণ দু-চার পৃষ্ঠা বাংলা তরজমা পড়েই তাফসীর করতে লেগে যান। গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে প্রাইমারী ধারণা নিয়েই বক্তাগণ দেদারসে মাসআলা বলে দেন! অনুরূপভাবে কোন এক বিষয়ে পারদর্শিতা আছে বলেই যে বিষয়ে যোগ্যতা নেই সে বিষয়েও অনেকে মুখ চালাতে থাকেন।

এ ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আজকাল কিছু যোগ্য লোক বিশেষত তরুণ আলেমদের একটি অংশ দীনী খিদমতের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেন। তারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা মুরুব্বী উলামায়ে কেরাম দ্বারা নযরে সানী বা সম্পাদনা না করিয়েই বাজারজাত করছেন। এতে অনেক ক্ষেত্রে ইনতিশার পয়দা হচ্ছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আপনি তাহকীক ও গবেষণা করেছেন এবং কোনো একটি বিষয় আপনার গবেষণায় ভিন্নভাবে ধরা পড়েছে– ভালো কথা! আল্লাহ আপনার তাহকীক ও গবেষণায় বরকত দিন! কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে গবেষণাপত্রটি আপনার উস্তাদ ও মুরুব্বী দ্বারা নযরে সানী করিয়ে নিন। হতে পারে, আপনার গবেষণার সূত্র ও পদ্ধতিই গলদ ছিল, ফলে ভুল নতীযা তথা ফলাফল বের হয়েছে । অথবা নতীযা ও সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় তা প্রকাশযোগ্য নয় কিংবা প্রকাশযোগ্য হলেও আপনার নির্বাচিত প্রকাশভঙ্গিটি ফলপ্রসূ নয়! আবূ দাঊদ শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসটি তো আপনার জানা আছে–

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ، قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ، وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ – زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا

(অর্থ:) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাত্রিকালে (পরিদর্শনে) বের হলেন। হযরত আবূ বকর রা.-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তিনি নামাযে নিচুস্বরে তিলাওয়াত করছেন। অতঃপর হযরত উমর রা.-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তিনি উঁচুস্বরে তিলাওয়াত করছেন। অতঃপর যখন উভয়ে নবীজীর নিকট সমবেত হলেন, নবীজী বললেন, হে আবূ বকর! তোমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তুমি নিচুস্বরে তিলাওয়াত করছিলে! (কারণ কী?) হযরত আবূ বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যার সঙ্গে আমি গোপন-আলাপ করছিলাম, তাকেই শোনাচ্ছিলাম! (অর্থাৎ, আল্লাহকে শোনাচ্ছিলাম, আর তিনি তো উঁচু-নিচু সব স্বর সমানভাবে শুনতে পান)। অতঃপর নবীজী হযরত উমর রা.-কে বললেন, উমর! তোমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তুমি উঁচুস্বরে

তিলাওয়াত করছিলে! (কারণ কী?) হযরত উমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘুমন্তদের জাগাচ্ছিলাম, শয়তানকে ভাগাচ্ছিলাম! উভয়ের এই বক্তব্য শোনার পর নবীজী বললেন, হে আবূ বকর! তোমার আওয়াজ আরেকটু উঁচু করবে! আর হে উমর! তোমার আওয়াজ আরেকটু নিচু করবে! (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৩২৯)

দেখুন, নামাযে উঁচু-নিচু উভয় স্বরেই তিলাওয়াত করা বৈধ। বিপরীতধর্মী দু'টি বৈধ পন্থার একটিকে বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে উভয় সাহাবী ইজতিহাদ করেছেন এবং মুরাজ্জিহের মাধ্যমে একটিকে তারজীহ দিয়ে আমল করেছেন। এতে তাদের কোন ভুল ছিল না। তা-সত্ত্বেও নবীজী উভয়কে নিজ নিজ স্বর পরিবর্তন করতে বললেন কেন? মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর অনেকগুলো কারণ ও হিকমতের মধ্যে এটাও বলেছেন যে, উম্মতের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গদ্বয় দু'টি বৈধ বিষয়ের একটিকে নিজস্ব ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুযায়ী তারজীহ দিয়েছিলেন এবং মুরুব্বী তথা নবীজী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার দ্বারস্থ হননি। এজন্য নবীজী উভয় হযরতকে নিজ নিজ মর্জি থেকে উনিশ-বিশ করে এই তা'লীম দিলেন যে, কোন দীনী কাজ আঞ্জাম দেয়ার একাধিক পদ্ধতি থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোন্ পদ্ধতিটি উপযোগী বা অধিক উপযোগী হবে, তা মুরুব্বীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিয়ে নেয়া চাই।

ইসলামের শুরু যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আকাবিরে দীনের যে সুবিশাল জামাআতের কথা আমরা জানি এবং যাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য পেশ করতে পারাকে নিজেদের কামালাত মনে করি, আমাদের জানামতে তাদের সকলের কর্মপন্থাই এমন ছিল। নিজের ও সমকালীন মুরুব্বীদেরকে হিতাকাঙ্ক্ষী না ভেবে, মুরুব্বীদের দ্বারা নিজের চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্ম নযরে সানী না করিয়ে, নিজেদের নতুন কোন কর্ম ও উদ্যোগে তাদের সমর্থন না নিয়ে কেউ কোনোকালে সফল হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই! আল্লাহ তা'আলা তরুণ উলামায়ে কেরামকে এই সত্যটি উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : শাইখে সানী ও নাযেমে দারুল ইকামা, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(২৬ পৃষ্ঠার পর : সাক্ষাৎকার)

**সাবের চৌধুরী :** বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের সক্রিয়তা এখন কোন পর্যায়ে আছে?

**আবু সালমান :** এটা একটা বড় প্রশ্ন। খতীব উবাইদুল হক সাহেব যখন ছিলেন, তখন কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বেশ ভালো একটা সরগরম অবস্থা ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এই কাজে অনেকটা ভাটা পড়েছে। এই সুযোগে ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ওরা এখন প্রকাশ্যে কুরআন প্রদর্শনীসহ নানা কর্মকাণ্ড করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ওদের সদস্য সংখ্যা কত ঠিক বলতে পারব না। ওদের কয়েকজন থেকে শুনেছি সংখ্যাটি পাঁচ লাখ। তবে, আমার দেখা মতে পাঁচ লাখ হবে না। বাকি যতই হোক, বেশ বেড়েছে। ওদের নানা অঙ্গ সংগঠন দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্যে সন্তান ওয়াকফ করে দেওয়ার রীতি গড়ে উঠেছে। এ কাজের জন্য 'ওয়াকফে নও' নামে ওদের একটা সংগঠন আছে। এই সংগঠন ছেলেগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মুবাল্লিগ বানিয়ে দাওয়াতী মিশনে পাঠায়। মেয়েদের সংগঠনের নাম– লাজনায়ে ইমাউল্লাহ। সাহায্য সংগঠনের নাম– লাজনা আনসারুল্লাহ। ঢাকার বকশি বাজারে ওদের প্রতিষ্ঠান আছে 'জামিয়া আহমাদিয়া' নামে। বিরাট প্রতিষ্ঠান। এখানে ছাত্রদেরকে ছয় বছরের মুবাল্লিগ কোর্স করিয়ে মুবাল্লিগ-মুআল্লিম বানিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠা তাদের ইবাদতখানাগুলোতে পাঠানো হয়। বর্তমানে একশোর উপরে এরকম মুআল্লিম কাজ করছে।

**সাবের চৌধুরী :** বাংলাদেশে কাদিয়ানী-দের মূলকেন্দ্রটি কোথায়?

**আবু সালমান :** ঢাকার বকশি বাজারে।

**সাবের চৌধুরী :** বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের আমীরের নাম কী?

**আবু সালমান :** আগে ছিল মীর মুবাশ্বির। এখন আছে আবদুল আওয়াল খান নামে একজন। এই লোক প্রাণ-আরএফএল কোম্পানির যে মালিক ছিল মেজর জেনারেল আমজাদ চৌধুরী– তার ফুফাতো ভাই।

**সাবের চৌধুরী :** আমরা যে শুনি প্রাণ-আরএফএল গ্রুপটি কাদিয়ানীদের। এ কথা কতটুকু সত্য?

**আবু সালমান :** প্রাণের মালিক আমজাদ চৌধুরী কাদিয়ানী ছিলেন। বর্তমানে তার দুই ছেলেও কাদিয়ানী।

**সাবের চৌধুরী :** কাদিয়ানীদের ব্যাপারে জানার জন্য বাংলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য কী কী বই আছে? কিছু বইয়ের নাম করলে পাঠকগণ উপকৃত হতেন।

**আবু সালমান :** কয়েকটি বইয়ের নাম বলা যায়। যেমন, মনযূর নোমানী রহ.-এর 'কাদিয়ানীরা কেন অমুসলিম?'। প্রকাশক, রাহনুমা প্রকাশনী, ঢাকা। মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত হয়েছে আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর 'কাদিয়ানী সম্প্রদায় : তত্ত্ব ও ইতিহাস। মাকতাবাতুল হেরা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ইদরীস কান্ধলবী রহ.-এর 'খতমে নবুওয়াত'। মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত 'আহমদী বন্ধু! ইসলামে ফিরে এসো। ইসলামই তোমার আসল ঠিকানা'। লেখক, মাওলানা আবদুল মাজিদ। মাকতাবাতুস সালাম থেকে প্রকাশিত 'কাদিয়ানীদেরকে চেনার সহজ উপায়'। লেখক, মাওলানা মনযূর নোমানী রহ.। মারকাজুদ দাওয়াহ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ইসলাম ও কাদিয়ানীয়াত দুটি আলাদা ধর্ম' নামে ছোট একটা পুস্তিকা।

**সাবের চৌধুরী :** জাযাকাল্লাহ। আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

(ফাতেহ২৪ডটকম-এর সৌজন্যে)

**দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা**

**রাবেতা কার্যালয়**

**জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া**

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ,

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

**ই-মেইল :** rabetaar@gmail.com

**মোবাইল**

০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৯১২০৭৪৪৯৫

## তাবলীগী বয়ান

### ১৯৮৯ ঈসাব্দে হালকার ৩ চিল্লার সাথীদের উদ্দেশ্যে কাকরাইল মসজিদে প্রদত্ত

# হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.-এর জরুরী বয়ান

**বয়ান লেখক: প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম**

*পটভূমি: দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর বিশেষ সোহবতপ্রাপ্ত এবং তৃতীয় হযরতজী ও আমার মুহতারাম শাইখ মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.-এর প্রায় নিত্যকার সফরসঙ্গী, দাওয়াত ও তাবলীগের বিশিষ্ট মুরুব্বী, ইলম ও মারেফাতের খাযানা হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.-এর নিম্নলিখিত বয়ানটি বর্তমান হালতের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক। এতে বলা হয়েছে– পথ দু'টি; একটি সঠিক, আরেকটি ভুল। সঠিক পথের পরিণাম জান্নাত, ভুল পথের পরিণতি জাহান্নাম। মেহনত যখন দীনের নামেই করা হচ্ছে, তো ভুল পথে কেন? ভুল পথে হাঁটলে তো সারা জীবনের সমস্ত মেহনতই বেকার। আল্লাহ তা'আলা দীনের নামে মেহনতকারী সকলকে হককে হক হিসেবে চেনার ও তার পূর্ণ অনুসরণ করার এবং না-হককে না-হক হিসেবে চেনার ও তা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।*

---

হামদ ও সালাতের পর নিম্নলিখিত আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ.

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ.

মেরে মুহতারাম দোস্তো!

দুনিয়াতে আমরা ভালো-মন্দ বিভিন্ন হালতের সম্মুখীন হই। হালত ঠিক রাখা এবং হালত বিগড়ানো– সব আল্লাহর হাতে। এ ব্যাপারে আল্লাহর যাবেতা বা সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষের মধ্যে দীনদারী আসলে তিনি হালত ঠিক রাখেন আর বে-দীনী আসলে হালত বিগড়ে দেন।

দীনদারী আর বে-দীনী কিভাবে আসে? দীনদারী আসে হেদায়াত আসলে, আর বে-দীনী আসে গোমরাহী আসলে। হেদায়াত আর গোমরাহী আসে কখন? যখন আল্লাহ চান।

وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

অর্থ: আর আল্লাহ তা'আলা যাকে চান, তাকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দেন। (সূরা বাকারা-২১৩)

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا

অর্থ: যদি চাইতাম সবাইকে হেদায়াত দিতাম। (সূরা সাজদাহ-১৩)

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা বলছেন 'যদি চাইতাম।' বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা সবার জন্য হেদায়াত চান না। তবে হেদায়াত কখন চান, আর গোমরাহী কখন চান সেটাও তিনি বলে দিয়েছেন।

দুই জিনিসে কর্মশক্তি ব্যয় করলে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দিবেন, আর এক জিনিসে কর্মশক্তি লাগালে গোমরাহ করবেন। এটা আল্লাহ তা'আলার যাবেতা বা সাধারণ নিয়ম। সচরাচর এর ব্যত্যয় ঘটে না।

মানুষ আমের জন্য মেহনত করলে আল্লাহ তা'আলা জাম দেন না। আর জামের জন্য মেহনত করলে আম দেন না। এটাই যাবেতা বা সাধারণ নিয়ম। যদিও তিনি আমগাছে জাম, আর জামগাছে আম দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণত তিনি তা করেন না।

বলছিলাম, দুই জিনিসে কর্মশক্তি লাগালে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দেয়ার ইচ্ছা করবেন–

**এক.** নবীওয়ালা মেহনত।

তবে নবীর তরীকায় করতে হবে; নিজের মনমতো নয়।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ: যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ নেক আমলকারীদের সাথে আছেন। (সূরা আনকাবূত-৬৯)

**দুই.** খাঁটি তলব ও আগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ

(আয়াতের প্রসিদ্ধ তরজমা তো এই যে, আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত দান করেন। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর আরেকটি তরজমা হতে পারে–)

অর্থ: 'যে চায়, আল্লাহ তাকে হোদায়াত দান করেন।' (সূরা আল কাসাস-৫৬)

(নিম্নোক্ত আয়াতের তরজমার ক্ষেত্রেও উল্লিখিত কথা প্রযোজ্য।)

وَاَنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হেদায়েত দেন, যে তা কামনা করে। (সূরা হজ্জ-১৬)

আর এক কাজে আল্লাহ গোমরাহ করেন। সেটা হল, ইত্তিবায়ে হাওয়া। ইত্তিবায়ে হাওয়া মানে 'জী-চাহি' (মনের চাহিদা মোতাবেক) জীবন যাপন করা। মনের খেয়াল-খুশি মতো চলা।

এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– ১. হাওয়া। ২. নফস। ৩. শাহওয়াত।

কেউ নিজ খেয়াল-খুশি মতো চললেই গোমরাহ হয়ে যায় না; বরং এর দ্বারা প্রথমে গোমরাহীর জীবাণু পয়দা হয়। যেমন, মানুষের শরীরে প্রথমে যক্ষ্মার জীবাণু দেখা দেয়। টিকা গ্রহণ করে মেরে ফেললে সেটা আর সক্রিয় হয় না। তেমনি গোমরাহীর জীবাণু দেখা দেয়ার পর সেটাকে ধ্বংস করে ফেললে গোমরাহ হয় না।

বলছিলাম, হেদায়াতের জন্য খাঁটি তলব লাগবে। যার মধ্যে তলব নেই আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন না। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজ স্ত্রী ও পুত্রের উপর মেহনত করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে তলব না থাকায় আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দেননি।

নবীজীর চাচার নাম ছিল আবূ তালেব অর্থাৎ পরম আগ্রহী। বিয়াল্লিশটি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছেন। বিয়াল্লিশটি বছর নবীজীর দৈহিক হেফাজতের জন্যে মেহনত করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে নবীর আনীত দীনের প্রতি তলব ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকেও হেদায়াত দেননি।

আর খাঁটি তলব পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দেন, তা সে যে-ই হোক না কেন! ফেরআউনের পার্লামেন্টের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ

তা'আলা হেদায়াত দিয়েছেন। কারণ, তার মধ্যে তলব ও আগ্রহ ছিল।

যাবেতা বা সাধারণ নিয়ম এটাই যে, নবীওয়ালা মেহনত ও তলব পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দিবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নবীওয়ালা মেহনত ও তলব ছাড়াই কাউকে হেদায়াত দিয়ে দিলে কেউ তা রুখতে পারবে না। আল্লাহ চাইলে কেউ মনমতো চললেও তাকে গোমরাহী থেকে রুখতে পারেন, হেদায়াত দিতে পারেন। এটা আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী; তিনি ইচ্ছা করলে কেউ রুখতে পারে না।

তবে ওয়াদা যেটা সেটাই পাকা কথা। আমাদের পাকা কথার উপর আমল করা চাই। নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলছি, তবুও আল্লাহ মেহেরবানী করে হেদায়াত দিতে পারেন– এমন ধারণায় না থাকি।

এখানে আসার আগে হযরতজী দামাত বারাকাতুহুমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন বিষয়ে কথা বলবো? বলেছেন, ইত্তিবায়ে সুন্নাতের উপর কথা বলবে। ব্যস, এখন সে প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ...

অর্থ: (হে নবী!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ করো, এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালাবাসবেন এবং তোমাদের খাতিরে তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত পেতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবা তথা অনুসরণ করতে হবে। আকাইদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাকের লাইনে ইত্তেবা করতে হবে।

মেরে মুহতারাম দোস্তো!

আরেকটি ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহর ইত্তিবা করতে হবে। সেটা হলো রাসূলুল্লাহর কাম। এই কাম তিনি জীবনে একদিনের জন্যেও ছাড়েননি। জীবনের শেষ পর্যন্ত করে গিয়েছেন। সেই কাম হলো দাওয়াতের মেহনত। সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনও মওত পর্যন্ত দাওয়াতের মেহনত করে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যেহেতু নবীজীর কাছ থেকেই দাওয়াতের মেহনত শিখেছিলেন, তাই আমরাও দাওয়াতের মেহনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর ইত্তিবা করব।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ...

অর্থ: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে... (সূরা তাওবা-১০০)

নবীজীর এই কামকে নিজের কাম বানালে আল্লাহ পাকের মদদ আসবে। নবীজীর কামকে কাম বানানোর অর্থ কী? যখন দাওয়াতের কামের তাকাযা আসে সংসারের কামকে আগে-পরে করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামকে কাম বানাতে হলে তিনভাবে কাজ করতে হবে–

১. মাকামে থেকে মেহনত করা।

২. বাইরে গিয়ে মেহনত করা।

৩. বাইরের জামাত আসলে নুসরত করা।

তাহলে আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস দান করবেন–

১. ঈমান পাকা হবে।

২. ভুল-ত্রুটি (গুনাহ) মাফ করবেন।

৩. ইজ্জতের রিযিক দিবেন এবং গোমরাহীর জীবাণু খতম করবেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْا اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ.

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও তাদের সাহায্য করেছে তারা সকলেই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল-৭৪)

এ আয়াতে কারীমায় সব কথা এসে গেছে।

তাকাযা আসতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ও তাকাযা আসতো। সাহাবায়ে কেরাম রা. ঘর-সংসার আগে-পরে করে সে সব তাকাযা পুরা করতেন।

এখন ইজতেমা থেকে বের হওয়া জামাতগুলো বিভিন্ন এলাকায় সময় লাগাচ্ছে। আপনারা ইজতেমার আগেও সময় লাগিয়েছেন মাশাআল্লাহ। আপনাদের সে মেহনতের বদৌলতে সুন্দরভাবে ইজতেমা সম্পন্ন হয়েছে। এখন তাকাযা হচ্ছে চলমান জামাতগুলোকে নুসরত করা।

দীনের তাকাযা পুরা করলে আল্লাহ তা'আলা তিনভাবে মদদ করবেন।

১. গায়েব থেকে জরুরত পুরা করবেন।

২. গায়েব থেকে পেরেশানী দূর করবেন।

৩. গায়েব থেকে দীনের প্রচার-প্রসারে আমাকে ব্যবহার করবেন।

আমাদের ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তার দীনের কাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আমাদেরকে ব্যবহার না করা হলে আমরা তো বঞ্চিত রয়ে গেলাম।

আরেকটি কথা শুনে রাখুন। এক হলো সময়ের তাকাযা, যেটা আমরা কুরবানীর সাথে পুরা করবো। আরেক হলো সার্বক্ষণিক কাজ, যেটা আমাদেরকে মুজাহাদার সাথে সব সময় পুরা করতে হবে। অর্থাৎ নিজ অবস্থানস্থলে আড়াই ঘণ্টা বা আট ঘণ্টা পুরা করা। মুআমালাত, মুআশারাত পাকিযা রাখা। আখলাক-চরিত্র সুন্দর করা। পাকিযা মুআশারাতে ঘরের লোকের দিল আকর্ষিত হবে। আর পাকিযা মুআমালাতে সারা দুনিয়ার মানুষের দিল আকর্ষিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার হুকুম দুই প্রকার–

১. কানুনী হুকুম

২. আখলাকী হুকুম

কানুনী হুকুম ছাড়লে সাজা আছে। যেমন যাকাত। আখলাকী হুকুম ছাড়লে সাজা নেই। যেমন সদকা, হাদিয়া। আখলাকী হুকুম পুরা করলে অনেক সাওয়াব আছে। দীন যিন্দা হবে আখলাকী হুকুমের দ্বারা।

দাওয়াতের কামের যরিয়ায় সোয়া-শ' কোটি মুসলমানের মধ্যে পাকিযা আখলাক আসলে দুনিয়ার অন্যান্য লোকেরাও তা দেখবে, প্রভাবিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরেও পরিবর্তন আনবেন। মুসলমানগণ নিজেদের দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে নিলে, এরপর যদি কেউ বাধা দেয়, মাকড়সার জাল ঝাড়ু দিয়ে সাফ করার মত আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে সাফ করে দিবেন।

এজন্য নিয়ত করে নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামকে কাম বানাবো, গমকে গম (পেরেশানী) বানাবো এবং ফিকিরকে ফিকির বানাবো।

নিয়ত করাটা হল ছাদের মত। ছাদে উঠতে সিঁড়ি লাগে; লাফ দিয়ে উঠা যায় না, ধাপে ধাপে উঠতে হয়। জীবনে লাগাতার চার মাস, অতঃপর বছরে এক চিল্লা, মাসে তিন দিন, সপ্তাহে দুই গাশত, মারকায মসজিদে খানা-বিছানা নিয়ে সূর্য ডোবা থেকে উঠা পর্যন্ত সাপ্তাহিক শবগুযারী, দৈনিক আড়াই ঘণ্টা, দুই তা'লীম– এগুলো হচ্ছে ছাদে উঠার প্রথম সিঁড়ি।

বছরে চার মাস, মাসে দশ দিন, দৈনিক আট ঘণ্টা– এগুলো হলো দ্বিতীয় সিঁড়ি। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ সিঁড়িও আছে। এ মজমায় বহু ভাই দ্বিতীয় সিঁড়িতে বা আরও উপরের সিঁড়িতে থেকে থাকবেন। যে যে সিঁড়িতেই আছেন, মেহনত করে করে নিজেকে উপরের সিঁড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

এভাবে মেহনত করতে করতে যদি ছাদে উঠার আগেই মওত এসে যায়, ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাশর হবে। এটা আমার কথা নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

কুরআন শিখতে শিখতে মারা গেলে কুরআন পড়নেওয়ালার সাথে হাশর হবে। হজ্জের সফরে বের হয়ে হজ্জ নসীব হওয়ার আগেই মারা গেলে কেয়ামতের দিন লাব্বাইক বলতে বলতে উঠবে।

এই হাদীসের আলোকে নিশ্চিত করে বলা যায়, কেউ ছাদ পর্যন্ত উঠার আগেই মারা গেলে আজর ও সাওয়াব মিলে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাশর হবে।

তবে ছাদে উঠার এই মেহনতে কিছু কষ্ট হবে। এটাই মুজাহাদা। আর মুজাহাদায় লুকিয়ে আছে মদদ।

আমের বিচিতে যেমন লুকিয়ে থাকে আম, তরমুজের দানায় থাকে তরমুজ তেমনি মুজাহাদার বীজে লুকিয়ে আছে আল্লাহর সাহায্য ও মদদ।

কখনও কখনও মুজাহাদায় নগদে মদদ আসে না, বিলম্ব হয়। তখন কান্না আসে। মেহনত করে নগদ ফলাফল না পেলে কান্না আসে। এটা মানুষের স্বভাব।

يُرِيْدُاللهُ اَن يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। আর মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা নিসা-২৮)

এভাবে বান্দা যখন চোখের পানি ফেলতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার তাআল্লুক বাড়ে, সম্পর্ক মজবুত হয়।

তখন আল্লাহ যেন বান্দাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন– বান্দা! আমিই তোমাকে কাঁদাচ্ছি, তোমার কান্না আমার ভাল লাগে।

আসলেই তো, হাজত-জরুরত পুরা করে দিলে কাঁদবে কে? তবে আল্লাহ তা'আলা এত বেশি মুজাহাদাও নেন না যে, কেউ হতাশ হয়ে পড়ে। মুজাহাদায় মদদ আসবেই, তবে কখনও বিলম্ব ঘটে।

মুজাহাদায় প্রথমত আসে উন্নতি। এরপর আসে মদদ। আর মদদে আসে তাসাল্লী বা সান্ত্বনা। মুজাহাদা-মদদ, মুজাহাদা-মদদ, মুজাহাদা-মদদ– এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকবে। যখন মৃত্যু আসবে, মওতের ফেরেশতা সালাম দিবে। সুতরাং মুজাহাদায় ঘাবড়াতে নেই। মুজাহাদার পর উন্নতি আসবেই। আর মদদেও উল্লসিত হতে নেই। উল্লসিত হওয়া মানে মেহনত ছেড়ে দেয়া।

মেহনত এমনভাবে করতে হবে, যাতে পরিবার-পরিজন এবং কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামকে কাম বানায়। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাউজে কাউসার থেকে পান করাবেন তখন বলতে পারব– ইয়া রাসূলাল্লাহ! একে পান করান, একে পান করান!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاَنَّ هذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

অর্থ: এই হলো আমার রাস্তা, একদম সহজ-সরল, আমার পেছন পেছন চলে আসো, গলিপথগুলোতে যেয়ো না। (সূরা আনআম-১৫৩)

গলিপথ কী? নিজের মর্জি, মনের চাহিদা, ঘর-দোর, ব্যবসা-বাণিজ্য। আর নবীর রাস্তা কী?

قُلْ هذِه سَبِيْلِى اَدْعُوْا اِلَى اللهِ عَلى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِى

আয়াতে বর্ণিত اَدْعُوْا اِلَى اللهِ অর্থ দাওয়াতের রাস্তা। আর اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِى অর্থ আমার ও যারা আমার পিছে পিছে চলে তাদেরও রাস্তা।

কালেমা পড়নেওয়ালাদের বড় একটা অংশ আজ গলিপথে হাঁটছে। তিন চিল্লা-চার মাস লাগালেই কেউ রাজপথে উঠে আসে না, রাজপথের পথিক হয়ে যায় না। এর দ্বারা গলিপথের পথিকদের মুখটা কেবল রাজপথের দিকে ঘুরে যায়। গলিপথে মানুষের সামনে থাকে নফস আর পেছনে থাকে শয়তান ।

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অর্থ: তারা ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে। (সূরা মারইয়াম-৫৯)

আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে– وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ 'তারা খাহেশাতে নফসানীর অনুগামী হল।' এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে আগে কুমন্ত্রণা দেয় নফস।

রাজপথ থেকে দূরে সরানোর জন্য নফস আর শয়তান দুটোই মেহনতে লেগে থাকে। আগে থাকে নফস আর পেছনে শয়তান। মোটকথা, গলিপথ হলো নফস ও শয়তানের রাস্তা। فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا গলিপথের শেষপ্রান্ত জাহান্নাম।

বলছিলাম, চার মাস আল্লাহর রাস্তায় লাগানোর পর মুখ ফিরে রাজপথের দিকে। মুখ ফিরলেই তো রাজপথে উঠল না। রাজপথে উঠার জন্য অগ্রসর হতে হবে। কাজেই চার মাস লাগিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে শয়তান আবার মুখ ঘুরিয়ে দিবে।

তাই বার্ষিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক মেহনত করে করে রাজপথের নিকটবর্তী হতে হবে। অতঃপর একসময় দাওয়াতে কাজের জন্য বিলকুল ফারেগ হয়ে যাবে। তখন গিয়ে পুরোপুরি রাজপথের পথিক হয়ে যাবে। রাজপথে উঠেও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা যাবে না। কেননা, গলিপথে শয়তান শুধু পেছন দিক থেকে হামলা করতো। রাজপথে উঠার পর শয়তান সবদিক থেকে হামলা করবে।

ثُمَّ لَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ

অর্থ: তারপর আমি (চারও দিক থেকে) তাদের উপর হামলা করব, তাদের সম্মুখ থেকেও, তাদের পিছন থেকেও, তাদের ডান দিক থেকেও, তাদের বাম দিক থেকেও, এবং তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না। (সূরা আ'রাফ-১৭)

শয়তান বড় মজবুতভাবে বলে দিয়েছে, সে রাজপথে ওঁৎ পেতে বসবে। গলিপথের পথিক তো নফসের জালে আটকা আছেই, শয়তানের সেখানে পেছন থেকে সাপোর্ট দিলেই চলে। কিন্তু যে পথিক রাজপথের কাছাকাছি উপনীত হয়েছে, সে যেহেতু নফসকে একরকম দমিয়ে ফেলেছে, এজন্য শয়তান তার সকল কলাকৌশল ও ছলচাতুরী এখানে প্রয়োগ করবে।

শয়তান কী করবে? কাম করনেওয়ালার রুটিনমত এসে উপস্থিত হবে। তাকে কাম করতে বাধা দিবে।

কেউ মেহনত করতে করতে গলির মাথায় এসে গেল। একটু পর রাজপথে ওঠার পালা। এইখানে তাকে একটু মোড় নিতে হবে। মোড় না নিয়ে সোজা চলে গেলে আর এক গলিতে ঢুকে পড়বে। ফলে সে রাজপথের কাছে এসেও উঠতে পারল না। অর্থাৎ সে শুধু

তার খাহেশ পরিবর্তন করল। এক খাহেশ ছেড়ে অন্য খাহেশের হাত ধরল। এজন্য গলির মাথায় এসে একটু মোড় নিতে হবে; একই রকম চালে চললে হবে না, অর্থাৎ কুরবানী বাড়াতে হবে।

রাজপথে উঠে আসার পর রাজপথে রেখেই শয়তান মুখটা উল্টোদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। এভাবে সে রাজপথে উঠে আসা পথিকের পিঠ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তখন রাজপথে অবস্থান করেও সে উল্টো দিকে চলতে থাকে এবং গন্তব্য থেকে দূরে সরতে থাকে। এজন্য আল্লাহ তা'আলাকে রাজি করার নিয়তে কাম করতে হবে। নয়তো রাজপথে থেকেও উল্টো দিকে যাওয়া লাগবে।

تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ..

অর্থ: তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। (ছফ্ফ-১১)

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ: তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (সূরা মায়িদা-৫৪)

جَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ: তারা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহাদা করে। (সূরা বাকারা-২১৮)

এই যে ফী-সাবীলিল্লাহ বলা হচ্ছে, এর মর্ম কী? মর্ম হচ্ছে মেহনত আল্লাহ তা'আলার রাজির জন্যে করা; দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য ও গরয না থাকা। তবে মেহনতও করতে হবে আবার ভয়ও থাকতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ لااُولٰئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

অর্থ: আর যারা যে কোন কাজই করে, তা করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। তারাই কল্যাণার্জনে তৎপরতা প্রদর্শন করছে এবং তারাই সে দিকে অগ্রসর হচ্ছে দ্রুতগতিতে। (সূরা মুমিনূন-৬০, ৬১)

খোদগরযী আর মনের খাহেশের সাথে সারা জীবন কাম করেও জাহান্নামে যেতে হবে, শহীদ হয়েও জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলাকে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে কুকুরকে পানি পান করিয়েও গুনাহগার মহিলা জান্নাতী হয়েছে।

**তাশকীল:** তাকাযা পুরা করার জন্য নগদ তৈরি হয়ে যাই। মুজাহাদায় মদদ লুকানো আছে। ব্যক্তিগত তাকাযা আগে পরে করি। দেশ-বিদেশের জন্যে বলি। পেছনে আল্লাহ তা'আলা যা মদদ করেছেন তা স্মরণ করি। সামনেও মদদ করবেন এর একীন করি।

এবার কিছু বাকী তাশকীলও হয়ে যাক। বছরে ৪ মাস কারা দিবেন দাঁড়ান। বছরে ২ মাস কারা দিবেন দাঁড়ান। বছরে ১ চিল্লা কারা দিবেন দাঁড়ান। রোযানা ৮ ঘণ্টা কারা? রোযানা আড়াই ঘণ্টা কারা?

৩২ হালকা আলাদা আলাদা বসুন। বসে তারতীব লিখে নিন, কার কখন ৪ মাস, ২ মাস বা চিল্লা লাগবে। কার কখন ৩ দিন লাগবে, রোযানা ওয়াক্ত লাগবে। এগুলোর এক কপি কাকরাইলে পৌঁছে দিবেন, আর এক কপি হালকায় জমা থাকবে। যেখানেই যাই, নগদের সাথে এই তারতীবে বাকীর তাশকীলও করি। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

*(বি.দ্র. আয়াত ও হাদীসসমূহের ইবারত এবং হাওয়ালা অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাসকারী: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ফাযেল, বয়ান লেখকের মেজো সাহেবযাদা মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম।)*


জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ কোর্স

বছরব্যাপী আমাদের কোর্সসমূহ
১ ১৬-২৭ **শাবান** (১২দিন)
২ ১-১৮ **রমযান** (১৮দিন)
৩ **সেমাহী** পরীক্ষার ছুটিতে ৬দিন
৪ **শশমাহী** পবীক্ষাব ছুটিতে ৬দিন

১ম ও ২য় কোর্সে বিশেষ গুরুত্বের সাথে যা থাকছে
১. আরবী রচনায় ভাষাগত যাবতীয় ত্রুটি সংশোধনের অনুশীলন।
২. নাহু-সরফসহ আরবী লিপির নিয়ম-কানূনের অনুশীলন।
৩. অনর্গল আরবীতে কথা বলার অনুশীলন।
৪. আরবীতে চিঠি-পত্র, দরখাস্ত, শুভেচ্ছা বার্তা, শোকবার্তা, আমন্ত্রণ ও প্রশংসাপত্র লেখার অনুশীলন।
৫. প্রাচীন ও আধুনিক আরবী ইবারত বিশুদ্ধরূপে পাঠের অনুশীলন।
৬. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আধুনিক আরবী অনুশীলন।
৭. আরবীতে যে কোন বাক্য গঠনের অনুশীলন।
৮. আরবী-বাংলা, বাংলা-আরবী অনুবাদের নিয়ম-কানূন ও তার অনুশীলন।
৯. আরবী পত্রিকা, ম্যাগাজিন পাঠের অনুশীলন।
১০. বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত লিপি (খত্তুর রুক'আ) অনুশীলন।

ভর্তির যোগ্যতা
হেদায়াতুন্নাহু থেকে উপরের যে কোন জামা'আত অথবা এর সমমান

থাকা-খাওয়া ফ্রি

কোর্স ফি
১ম কোর্স- ৮০০/-
২য় কোর্স- ৮০০/-
৩য় কোর্স- ১২০০/-
৪র্থ কোর্স- ১৮০০/-

৩য় ও ৪র্থ কোর্সে বিশেষ গুরুত্বের সাথে যা থাকছে
১. অনর্গল আরবীতে কথা বলার অনুশীলন।
২. প্রাচীন ও আধুনিক আরবী ইবারত বিশুদ্ধরূপে পাঠের অনুশীলন।
৩ বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত লিপি (খত্তুর রুক'আ) অনুশীলন।

বি.দ্র: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি ৭ শাওয়াল

ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক কিতাবসমূহ: مختارات من أدب العرب، كتب القواعد، تعال نتكلم بالعربية
مجموعة المقالات والفقرات والانطباعات، صور من حياة الصحابة، مقالاتي المختارة

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!
অনর্গল আরবী কথা বলা শেখা ও শেখানোর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব।
মাহে রমযানসহ বিভিন্ন ছুটিতে আরবী কথোপকথন প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্য উপযোগী একটি কিতাব

এসো আরবী বলি تعال نتكلم بالعربية

কিতাবটিতে যা আছে
> নিত্য ব্যবহার্য বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত الحوارات العربية (সংলাপ) এর সমাহার।
> বহুল ব্যবহৃত আধুনিক ও প্রাচীন প্রচুর আরবী শব্দার্থের সন্নিবেশ।
> কিতাবে ব্যবহৃত কঠিন শব্দসমুহের অর্থ সংযোজন।
> আরবীতে অনুষ্ঠান পরিচালনা, বক্তৃতা ও জুম'আর কতিপয় নমুনা খুতবা।
> অফসেট পেপার, মজবুত বাধাই ও দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ।

লেখক
মাওলানা রফীকুল্লাহ আলী আকবার আল মাদানী
খিররীজ: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।
উস্তায ও মুশরিফ: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান:
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১৫-৮০০১১৬
হাকীমুল উম্মাত প্রকাশনী,
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫

"কিতাবটিকে পাঠ্যতালিকাভূক্ত করলে আরবী ভাষা ও কথোপকথন শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।"
মন্তব্য করেছেন বেফাক ও আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিআতিল কওমিয়া এর সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা আহমদ শফী দা. বা. সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৬ খুচরা বিক্রয় মূল্য ২৪০/- আপনি আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

কোর্স তত্ত্বাবধান ও বিশেষ পাঠদান:
মাওলানা রফীকুল্লাহ আলী আকবার আলমাদানী হাফিজাহুল্লাহ
খিররীজ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদিআরব
*মুশরিফ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ*
*জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা*

মাওলানা মুঈনুদ্দীন ইবাদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ
*বহুভাষাবীদ মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রাহ. এর দীর্ঘদিনের সোহবতপ্রাপ্ত, বিশেষ শাগরিদ ও সহকর্মী।*
*নায়েবে মুশরিফ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ*
*জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা*

যাতায়াত: মুহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ তিন রাস্তার মোড় থেকে অটোরিকশা যোগে স্বপ্নধারা হাউজিং বড় মাদরাসা | যোগাযোগ ০১৯১৪৮০০৩১৫ ০১৯১৫৮০০১১৬

# আ ত্ম জী ব নী

*দারুল উলূম করাচীর মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে অনুবাদ করছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী।***

# ইয়াদেঁ - یادیں

## শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

**(নবম পর্ব -نویں قسط)**

**প্রাথমিক শিক্ষা**

বাবুল ইসলাম ছিল আমাদের বাসার সবচেয়ে নিকটবর্তী মসজিদ। হযরত আব্বাজান রহ. এই মসজিদে নামায পড়াতেন। সেখানে ইমদাদুল উলূম নামে একটি ছোট মাদরাসাও ছিল। কিন্তু সেটি ছিল নিছক ছবাহী মক্তব। আব্বাজান রহ. ওখানে বুনিয়াদী আরবী ও ফার্সী শেখানোর জন্য কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে হযরত মাওলানা ফযলে মুহাম্মদ সোয়াতী সাহেব ছিলেন প্রধান শিক্ষক। (এই বুযুর্গ প্রথমে দারুল উলূমে, এরপর বানুরী টাউনে এবং সর্বশেষ সোয়াতে নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতার মহান যিম্মাদারী পালন করেছেন। তার সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা আমি নুকুশে রফতেগাঁ নামক কিতাবে করেছি।) ইনি ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা আমীরুযযামান কাশ্মীরী সাহেব রহ. সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হযরত আব্বাজান রহ. মসজিদের প্রধান ফটকের ছাদে একটি কামরা বানিয়ে সেখানে দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাকিস্তান হিজরতের পরও হযরত আব্বাজান রহ.-এর কাছে নিয়মিত ইস্তিফতা (শরয়ী জিজ্ঞাসা) আসতে থাকতো। কিন্তু এসব ফতওয়ার অনুলিপি তৈরি ও সংরক্ষণের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা ছিল না। হযরত আব্বাজান রহ. নিজেই ডাকঘর থেকে ইস্তিফতা বা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতেন এবং জবাব লেখার পর নিজেই তা পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। এখন এই দারুল ইফতায় ফতওয়া লেখা, অনুলিপি তৈরি করা এবং প্রশ্নকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হলো। এ কাজের জন্য একজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে, যার নামটি এখন চেষ্টা সত্ত্বেও মনে পড়ছে না, নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো।

সে সময় আব্বাজান রহ. পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন অ্যাসেম্বলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগঠন 'বোর্ড তালীমাতে ইসলামিয়া'র সদস্যও ছিলেন। আমি 'হামদে বারী' কিতাবটি জ্যাকব লাইনের বাসায় থাকতেই পড়ে নিয়েছিলাম। হযরত আব্বাজান রহ. এবার আমাকে ফার্সীর কিতাব گلزار دبستاں শুরু করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে এই কিতাবের অল্প কিছু সবক দিয়ে নিজের সঙ্গে অ্যাসেম্বলীতে নিয়ে যেতেন। আমি সেখানে বসেই সবক ইয়াদ করে নিতাম। আব্বাজান কাজকর্ম সেরে আমার থেকে সবক শুনতেন। আমার প্রতি আব্বাজানের আচরণ ছিলো বড়ই মমতাপূর্ণ। কেবল একদিন তিনি আমাকে একটি চপেটাঘাত করেছিলেন। এর উপলক্ষ ছিল এই যে, گلزار دبستاں কিতাবের একজায়গায় বানর-এর ফার্সী শব্দ এসেছে بوزینہ (বূযীনা)। আমি বারবার এটিকে بوزنہ (বুযনা) পড়ছিলাম। আব্বাজান রহ. কয়েকবার বুঝালেন যে, এটা بوزنہ নয়, بوزینہ। কিন্তু কেন যেন আমার মুখের উপর بوزنہ চড়ে বসেছিলো। আব্বাজানের বারবার সতর্ক করার পরও কিতাবের যেখানেই এই শব্দ আসতো আমি بوزنہ পড়তাম। ব্যস, একদিন তিনি এক চপেটাঘাত করলেন, অমনি আমার মুখ বিলকুল ঠিক হয়ে গেল! এরপর আর কখনো আমি এই শব্দের উচ্চারণে ভুল করিনি। হ্যাঁ, তিনি আরেকবার আমাকে মেরেছিলেন; সেটি ছিলো ফজরের নামাযে না উঠার কারণে। আল্লাহ তা'আলা সর্বদা তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন। এই দু'টি ঘটনা ছাড়া তিনি আমাকে আর কখনো মারেননি।

এতোদিনে বাবুল ইসলাম মসজিদে আমার নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা শুরু হয়ে গেছে। আব্বাজান রহ. আমাকে হযরত মাওলানা ফযলে মুহাম্মদ সোয়াতী সাহেব রহ.-এর হাতে সোপর্দ করলেন। হযরত মাওলানা ফযলে মুহাম্মদ সাহেব রহ. অত্যন্ত যোগ্য উস্তাদ ছিলেন। সেই সাথে তার ব্যক্তিত্বও ছিল খুব ভয় জাগানিয়া। এতোদিন আমি আমার অনিয়মিত পড়াশোনা-কালীন গুলযারে দাবিস্তাঁ'য় আটকে ছিলাম। এখন উপরের জামাআতের কিছু শিক্ষার্থীও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। তাদের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব লাহোরী এবং মাওলানা ইসমাইল বলখী অন্যতম। উস্তাদ ফযলে মুহাম্মদ সাহেব রহ. তাদেরকে গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, আহসানুল কাওয়ায়েদ ইত্যাদি পড়াতে শুরু করলেন। তাদের পাশাপাশি আমাকেও কখনো কখনো সবক দিয়ে দিতেন। আর আমাকে সুন্দর হস্তাক্ষর শেখানোর জন্য তিনি সেই বুযুর্গের সোপর্দ করে দিলেন, যিনি দারুল ইফতায় ফতওয়া অনুলিপির খেদমত আঞ্জাম দিতেন। সন্ধ্যার সময় হযরত মাওলানা ফযলে মুহাম্মদ সাহেব রহ. যাচাই করতেন যে, বাস্তবেই আমি সারাদিন কিছু পড়েছি কিনা! এমনিতেই তাঁর ভয় জাগানিয়া ব্যক্তিত্ব আমার উপর ভীষণ প্রভাব ফেলতো। আর সন্ধ্যায় তাঁর মুখোমুখি দুশ্চিন্তায় পুরোটা দিন তটস্থ থাকতাম।

সেই সময়ের একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। আমি তখন ফার্সীর প্রাথমিক ছাত্র; তা-ও অনিয়মিত। দারুল ইফতার সেই বুযুর্গ, যিনি আমাকে হস্তাক্ষর শেখাতেন, কয়েকজন ছাত্রকে আরবীও পড়াতেন। একবার আমি লক্ষ্য করলাম, আরবী ভাষায় إنّ শব্দটি প্রচুর ব্যবহার হয়। আমি সেই উস্তাদজীকে জিজ্ঞেস করলাম, إنّ শব্দের অর্থ কী? তিনি বললেন, 'তাহকীক!' উত্তর শুনে আমার ঝুলিতে কিছুই পড়লো না! মনে মনে ভাবলাম, আরবী এতই কঠিন ভাষা যে, অনুবাদ করে দিলেও বুঝে আসে না!!

আমার বড়ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী সাহেব জনাব কারী ফখরুদ্দীন সাহেব রহ.-এর কাছে হিফয শোনাচ্ছিলেন। হিফয শোনানী সমাপ্ত হলে তাঁরও ফার্সী পড়ার সময় হলো। কিছুদিন পর যখন হযরত মাওলানা আমীরুযযামান কাশ্মীরী সাহেব রহ.-ও চলে আসলেন, তাঁকেও এই মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলো। এখন আমরা দুইভাই আরও কয়েকজন সাথীসহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাহবারে ফার্সী, তাইসীরুল মুবতাদী ইত্যাদি

কিতাব তাঁর কাছে পড়া শুরু করে দিলাম। আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন দরসগাহ (শ্রেণীকক্ষ) ছিলো না। যেহেতু বেতন নিয়ে মসজিদের ভেতর পড়ানো শরীয়তের দৃষ্টিতে মুনাসিব নয়, এজন্য হযরত মাওলানা রহ. আমাদেরকে মসজিদের উযূখানায় পড়াতেন। এটাই ছিলো আমার নিয়মিত ছাত্র হয়ে পড়াশোনার প্রথম পর্ব। আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা আমীরুযযামান কাশ্মীরী রহ.-কে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম নসীব করুন! তিনি সীমাহীন মহব্বত ও মায়া করে আমাদেরকে পড়াতেন। তিনি একজন বীর মুজাহিদও ছিলেন। ১৯৪৮ সালের কাশ্মীর যুদ্ধে এবং এরপর হায়দারাবাদের পুলিশি তাণ্ডবের সময় তিনি সশরীরে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সে সময়কার বিভিন্ন ঘটনাবলী তিনি বড় মজা করে, জয্বা ও উদ্দীপনার সাথে আমাদেরকে শোনাতেন। জিহাদের জয্বা তাঁর ধমনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছিলো। তাঁরই সান্নিধ্যের বরকতে আমাদের অন্তরেও জিহাদের জয্বা জাগ্রত হয়েছে এবং আমার নিত্যদিনের দু'আসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে– 'হে আল্লাহ! আমাকে মুজাহিদের জীবন এবং শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করো!'

**দারুল উলূম করাচী প্রতিষ্ঠা**

হযরত আব্বাজান রহ.-এর মনেপ্রাণে এই ফিকির মিশে ছিলো যে, দেশভাগের কারণে দীনী বড় বড় মারকায তো সব হিন্দুস্থানে রয়ে গেছে। যে সব এলাকা পাকিস্তানের অংশে এসেছে, সেগুলোতে দীনী মাদারিসের সংখ্যাও নগণ্য এবং পড়াশোনার অবস্থাও নেহাৎ কমযোর। বিশেষভাবে করাচীতে তখন বড় কোন মাদরাসা ছিলো না। করাচীর শহরতলীতে খাড্ডা নামক মহল্লায় মাযহারুল উলূম নামে একটিমাত্র দাওরায়ে হাদীস মাদরাসা ছিলো। কিন্তু শহরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এটি যথেষ্ট ছিলো না। এজন্য হযরত আব্বাজান রহ. সবসময় এই ফিকিরে বিভোর থাকতেন যে, এখানেও কোন মানসম্মত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হোক। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ যে, করাচীর নানকওয়াড়া নামক মহল্লায় শিখদের একটি স্কুল ছিলো। শিখরা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে এটি পরিত্যক্ত পড়ে ছিলো। শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে আব্বাজানকে সেটি দেয়া হলো। হযরত আব্বাজান রহ. হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব রহ.-এর সঙ্গে মিলে সেই ভবনটি সাফাই করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে সেখানে দরস তাদরীস এবং দারুল উলূমের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ১১ শাওয়াল, ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ৩ জুলাই, ১৯৫২ ঈসাব্দে দারুল উলূম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার পথচলা শুরু করে। দারুল উলূমের প্রথম বছর মেশকাত জামা'আত পর্যন্ত উন্নীত ছিলো। মেশকাতের দরস হযরত আব্বাজান রহ. নিজেই প্রদান করতেন। ১৩৭১ হিজরীর রমাযানুল মুবারকে ভাইজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী মাদ্দাযিল্লুহ হিফয শেষ করার পর আল্লাহ তা'আলার ফযলে ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক জুন, ১৯৫২ ঈসাব্দে মসজিদে বাবুল ইসলামে হযরত আব্বাজানের প্রতিষ্ঠিত দারুল ইফতায় তিনি তারাবীহ পড়িয়েছেন। এই ঈদের পরই দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দারুল উলূম করাচীকে আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গোটা সিন্ধ প্রদেশে এটিই ছিলো উল্লেখযোগ্য প্রথম দীনী মাদরাসা। বরং পুরো পাকিস্তানেই তখন হাতেগোনা কয়েকটি মাদরাসা ছিলো। এ কারণে দারুল উলূম ছিল প্রথিতযশা সেই সব উলামা হযরতদের শিক্ষকজীবনের সূচনাগার, যারা ছিলেন দেশের দীনী রাহনুমা ও অভিভাবক। উদাহরণত হযরত মাওলানা মুফতী ওলী হাসান সাহেব রহ., যাকে উলামায়ে কেরাম হযরত আব্বাজান রহ. এবং হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ হাসান সাহেব রহ.-এর পর মুফতীয়ে আযম পদে ভূষিত করেছেন, কোন দীনী প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে সে সময় তিনি ব্রাঞ্চ রোডস্থ একটি মাধ্যমিক স্কুলে (মেট্রোপুলিশ স্কুল) ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি দেওবন্দে হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেবের (দারুল উলূম করাচীর প্রথম নাযেম) সহপাঠী ছিলেন। হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব রহ. তাঁকে স্কুল থেকে দারুল উলূম করাচী নিয়ে এসেছেন। এখান থেকেই তিনি তাঁর খেদমতের জীবন শুরু করেছেন। তেমনিভাবে হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ সাহেব রহ., যিনি পরবর্তীকালে দারুল উলূম করাচীর শাইখুল হাদীস ও নাযেম হয়েছিলেন, সে সময় দানিশ কাদ্দা নামক মহল্লায় উলূমে শরকিয়্যাহ'র একটি শাখায় উর্দূ-আরবী পড়াতেন। সেটি ব্রাঞ্চ রোডে আমাদের বাসার পাশেই অবস্থিত ছিল। আমার ভাতিজা ও বন্ধু মাওলানা হাকীম মুশাররফ সাহেব সেই দিনগুলোতে 'আদিবে উর্দূ' পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি দানিশ কাদ্দা'য় পড়তেন। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে দানিশ কাদ্দা'য় গেলাম। হযরত মাওলানা সাহবান মাহমুদ সাহেব রহ. তখন বিশ্বখ্যাত কবি ডক্টর ইকবাল মরহুম-এর 'শিকওয়া-জওয়াবে শিকওয়া' পড়াচ্ছিলেন। তখন তাঁর যবান থেকে শোনা এই পংক্তিটি এখনও যেনো আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে–

نالۂ بلبل کے سنوں
اور ہمہ تن گوش رہوں،
ہمنوا! میں بھی کوئی
گل ہوں کہ خاموش رہوں۔

মুগ্ধ শ্রবণ রবে উন্মন,
শুন্‌তে কি সুর বুলবুলের!
নিশ্চুপ কেন রবো চিরদিন,
ফুল নই আমি মালঞ্চের?

(তরজমা: ফররুখ আহমদ)

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব রহ. হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ সাহেব রহ.-কে দারুল উলূমে নিয়ে এসেছেন। এখানেই তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু। হযরত মাওলানা ফযলে মুহাম্মদ সাহেব সোয়াতী রহ. এবং হযরত মাওলানা আমীরুযযামান কাশ্মীরী রহ.-এর শিক্ষকতার সূচনা যদিও বাবুল ইসলাম মসজিদ থেকে হয়েছিলো, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি, কিন্তু সেটি কোনো নিয়মিত মাদরাসা ছিল না। সে হিসেবে তাঁদেরও শিক্ষকতার নিয়মিত জীবন দারুল উলূম থেকে শুরু হয়। হযরত মাওলানা মাযহার বাক্বা সাহেব রহ., যিনি পরবর্তীতে দারুল উলূমের মুফতী পদে ভূষিত হন এবং সর্বশেষ মক্কা মুকাররমার জামি'আ উম্মুল কুরায় উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ পান, তার বক্তব্য অনুযায়ী তিনি একজন স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন; মাদরাসার যিন্দেগীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু আব্বাজান রহ.-এর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর তার জীবন পুরোপুরি পাল্টে যায়। তিনি সে ঘটনা ভারি মজা করে শোনাতেন। তিনি তার আত্মজীবনীতেও সেটি লিখেছেন। আব্বাজান রহ. তার মাঝে এক বিরল প্রতিভা লক্ষ্য করে তাকে দারুল উলূমে শিক্ষকতার দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রথমে তাকে ফতওয়া অনুলিপির যিম্মাদারী অর্পণ করেন।

অতঃপর ফতওয়া প্রদানের তরবিয়ত দিয়ে তাঁকে নায়েবে মুফতী পদে উন্নীত করেন। হযরত মাওলানা ক্বারী রেআয়াতুল্লাহ সাহেব রহ.-ও পাকিস্তানে শিক্ষকতার সূচনা এখান থেকে শুরু করেন। হযরত মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব রহ., যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের সিপাহসালার হয়ে উঠেন, তাকেও আব্বাজান রহ. দারুল উলূমে দাওয়াত দিয়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এখান থেকেই তার ইলম ও ফযলের চর্চা শুরু হয়। হযরত মাওলানা মুনতাখাবুল হক সাহেব রহ.-ও দারুল উলূমে শিক্ষকতার কাজ আঞ্জাম দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি করাচী ইউনিভার্সিটির ইসলাম বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাতীন খতীব সাহেব রহ.-ও লাহোর থেকে স্থানান্তর হয়ে দারুল উলূমে তাশরীফ আনেন। এখানে তাফসীরে জালালাইন এর দরস দেয়া শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি নায়েবে নাযেমের দায়িত্বও পালন করেছেন। এ-ই কারণ যে, হযরত মাওলানা ওলী হাসান রহ. দারুল উলূম করাচীকে উলামায়ে কেরামের মা বলতেন। প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই দারুল উলূমে শিক্ষার্থীদের চাপ এতোটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, সে সময় ছাত্রাবাস ও দরসগাহের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো না। দিনের বেলা ক্লাস চলাকালীন ছাত্রদের বিছানাপত্র কামরার চারদিকের দেয়াল ঘেঁষে গুটিয়ে রাখা হতো। রাতের বেলা শোয়ার জন্য যখন সেই বিছানাপত্র খোলা হতো, কামরার মধ্যে হাঁটা-চলার জায়গাটুকুও থাকতো না।

যখন আমি দারুল উলূমে পড়া শুরু করি তখন আমি মাত্র ফার্সী পড়ছি। আর আমার বয়স তখন ৯ বছর ছিলো। এ সময় আমার বড় ভাই মুফতী রফী উসমানী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুম হিফয পড়ছিলেন। আমি হিফয পড়া থেকে মাহরূম ছিলাম, এই সুবাদে ফার্সীখানায় এসে আমরা দু'জন সহপাঠী হয়ে যাই।

সে সময় হযরত মাওলানা বদীউযযামান রহ. উন্নাই'র প্রসিদ্ধ মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে দারুল উলূমে আগমন করেন। আমাদের দরসের সমস্ত কিতাব তিনি পড়াতেন। রিসালায়ে নাদের, পান্দেনামায়ে আত্তার, ইনশায়ে ফারেগ, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, আহসানুল কাওয়াইদ এই সব কিতাব আমরা মাওলানা সাহেবের কাছে পড়েছি। ভাই সাহেবের (রফী উসমানী) এক ডাইরীতে লেখা ছিলো–

"মুহাররাম ১৩৭২ হিজরী মোতাবেক ১ অক্টোবর ১৯৫২ ঈসাব্দে আজ মাদরাসায়ে আরাবিয়্যাহ দারুল উলূমে হযরত মাওলানা বদীউযযামান রহ.-এর কাছে গুলিস্তাঁ শুরু হয়েছে।"

কিতাব পড়ানোর সাথে সাথে তিনি আমাদেরকে ফার্সী কাব্য রচনার প্রশিক্ষণও দিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা অনেক অনেক উঁচু করুন, তিনি আমাদেরকে সীমাহীন ভালবাসা ও স্নেহের সাথে পড়িয়েছেন। আমাদেরকে ফার্সীর সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেছেন যে, ফার্সী কাব্য, প্রবাদ ইত্যাদি বোঝার যোগ্যতা আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। সে বছর আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল দারুল উলূমের প্রথম স্মরণিকায় ছাপা হয়েছিলো। যেহেতু ৮ বছর বয়সে আম্মা-আব্বার সঙ্গে হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো, সেজন্য আমার কয়েকজন উস্তাদ আমাকে আদর করে 'হাজি জী' বলে ডাকতেন। (হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ রহ. আমার দুষ্টুমির কারণে আমাকে এই ওজনের সাথে মিলিয়ে 'পাজি জী' বলে ডাকতেন। উস্তাদজীর এমন আদুরে সম্ভাষণে আমার বেশ আনন্দ লাগতো।) তো ঐ স্মরণিকায়ও আমার নাম 'হাজী মুহাম্মদ তাকী' লেখা হয়েছিলো।

দারুল উলূম দেওবন্দের পুরনো নিয়ম অনুযায়ী দারুল উলূম করাচীতেও এই নিয়ম ছিলো যে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি কিতাবের পূর্ণমান হবে ৫০। যে ছাত্র ৪৮ নম্বর পেতো তাকে প্রথম স্তরে উত্তীর্ণ মনে করা হতো। ৪৭ থেকে ৪৫ পর্যন্ত ছিলো ২য় স্তর। আর ৪৪ থেকে ৪০ পর্যন্ত ছিলো তৃতীয় স্তর। ৪০ থেকে ৩৫ পর্যন্ত নম্বর প্রাপ্তদের পাশ ধরা হতো। সাধারণত এদেরকে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করা হতো। ৩৫ থেকে কম নম্বর প্রাপ্তদের অকৃতকার্য বিবেচনা করা হতো। সেইসাথে এই ঘোষণাও ছিলো যে, যদিও পূর্ণমান ৫০, কিন্তু কোনো ছাত্র যদি খুবই ভালো পরীক্ষা দেয় তাহলে তাকে ৫০ এর বেশি নম্বর দেওয়া হবে। ভালো ছাত্রদের কেউ কেউ ৫১/৫২ নম্বরও পেতো। এই নিয়ম অনুযায়ী আমার এ বছরের ফলাফল ছিলো–

গুলিস্তাঁ-৫১, বুস্তাঁ-৪৫, আহসানুল কাওয়াইদ-৫০, ইনশায়ে ফারেগ-৫১, গণিত-৫০, হস্তাক্ষর-৪০, তরজমা-৪৮, মালাবুদ্দা মিনহু-৪৯, জামালুল কুরআন-৫১, কিরাত-৪৯।

**আরবী শিক্ষার সূচনা**

সামনের বছর অর্থাৎ শাওয়াল ১৩৭২ হিজরী মোতাবেক জুলাই ১৯৫৩ ঈসাব্দে আমাদের আরবী শিক্ষার সূচনা হয়। তখন আমার বয়স ছিলো দশ। আরবী কা মু'আল্লিম ছাড়া আমাদের বাকি সব কিতাব হযরত মাওলানা সাহবান রহ.-এর কাছে ছিলো। আমরা একই বছর ছরফের কিতাব মীযান, মুনশায়িব, পাঞ্জেগাঞ্জ, ইলমুছ ছীগা; নাহবের কিতাব নাহবেমীর, শরহে মিয়াতে আমেল, হেদায়াতুন্নাহব; আদবের কিতাব হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর দুরুসুল আদব, এরপর মুফীদুত্তালেবীন হযরতের কাছেই পড়েছি। আরবি কা মু'আল্লিম হযরত মাওলানা মুফতী ওলী হাসান রহ.-এর কাছে পড়েছি। হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর আরবী সাহিত্যের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিলো। তিনি আমাদেরকে অনেক আগ্রহের সাথে আরবী লেখার চর্চা করাতে শুরু করেন। বয়সস্বল্পতার দরুন আমি নাহব-ছরফের সূক্ষ্ম মাসআলাগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করতে সক্ষম ছিলাম না। কিন্তু লেখার অভ্যাস ও স্পৃহা আগে থেকেই ছিলো। সেজন্য লেখা-চর্চায় অধিকাংশই আমি উর্ত্তীর্ণ হতাম। যদিও আমার হাতের লেখা অনেক খারাপ ছিলো। দীর্ঘদিন পর আমার হাতের লেখায় উন্নতি এসেছে। আমার বয়সস্বল্পতার দরুন উস্তাদগণ আমার অল্পকে অনেক মনে করে হিম্মত বাড়ানোর জন্য ছাড় দিতেন। তাকরার [গ্রুপস্টাডি]-এর ক্ষেত্রেও আমার সময় লাগতো। আমার কথায় মাধুর্য ছিলো না। বলার সময় আমি বেশিরভাগ আটকে যেতাম। সেজন্য বেশিরভাগ তাকরার আমার বড় ভাই মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী সাহেব করাতেন। মাশাআল্লাহ! তাঁর কথাবার্তা শুরু থেকেই সরস ছিলো।

হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ সাহেব রহ. প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের সাপ্তাহিক পরীক্ষা নিতেন। এ কারণে আমাদেরকে পুরো সপ্তাহজুড়ে গভীর মনোযোগী হয়ে পড়তে হতো। তার চমৎকার পাঠদান পদ্ধতির উসিলায় আমরা সে বছর এতো কিতাব পড়েছি যে, হালযামানার দুই শ্রেণীর কিতাব আমাদের এক বছরেই পড়া হয়ে গেছে। আমরা নাহবেমীরের সাথে শরহে মিয়াতে আমেল, হেদায়াতুন্নাহব; মীযানের সাথে পাঞ্জেগাঞ্জ, ইলমুছ ছীগা; দুরুসুল আদব ও মুফীদুত্তালেবীনের সাথে ফিকহের

কিতাব নূরুল-ঈযাহ একই বছর পড়েছি। হযরতের কাছে একটা লম্বা লাঠি ছিল, যা শুধু শিক্ষার্থীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য রাখতেন। লাঠি ব্যবহারের উপলক্ষ খুব কমই আসতো, আবার মাঝেমধ্যে চলেও আসতো। এক-দুইবার আমারও এর স্বাদ আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়েছিলো!

আমাদের শ্রেণীতে আমার সমবয়সী কেউ ছিলো না। সবাই ছিলো বয়সে আমার বড়। এ কারণে দরসের বাইরে খেলাধুলা বা চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে আমার কোন জুটি ছিলো না। আমার বন্ধুত্ব ছিলো নিচের জামাআতের ছাত্রদের সাথে। আমার সহপাঠীদের মধ্যে আমার বড় ভাই ছাড়া মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুখতার সাহেব শহীদ রহ. (সাবেক মুহতামিম, জামি'আ ইসলামিয়া বানুরী টাউন)-এর বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ আহমাদ সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুম ছিলেন। তিনি বর্তমানে মক্কা মুকাররমায় আছেন। আর মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুখতার সাহেব আমাদের এক বছর নিচের শ্রেণীতে ছিলেন। আমার ভাতিজা হাকীম মোশাররফ হোসাইন সাহেবও তাদের সহপাঠী ছিলেন। ক্বারী মুহাম্মদ ইসমাঈল মিরাঠী সাহেবও তাদের শ্রেণীতে ছিলেন। পড়াশোনা শেষ করে আমি তাদের সঙ্গে নিকটবর্তী পার্কে অথবা দারুল উলূমের চৌহদ্দিতেই কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে আসতাম। কাবাডি, ডাংগুলি, ক্রিকেট থেকে নিয়ে সব খেলাতেই তারা দু'জন বেশ পারঙ্গম ছিলেন। আমি স্রেফ তাদের সহচর হয়ে থাকতাম। কোনো খেলাতেই আমি পারদর্শিতা অর্জন করতে পারিনি। এমনিতেও আসরের পর বাসায় যাওয়ার তাড়া থাকতো, তাই খেলার সময়ও পেতাম না তেমন। মাদরাসার পার্শ্ববর্তী পার্কের সামনে একটা টং দোকান ছিলো। দোকানটিতে বাদামভাজা, ছোলাবুট ইত্যাদি বিক্রি হতো। এগুলোর লোভনীয় সুবাস আমার দুপুরের ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে দিতো। আম্মাজান আমাকে হাতখরচের জন্য প্রতিদিন একআনা দিতেন। এই একআনা তখনকার দিনে একটি শিশুর শখ পূরণে যথেষ্ট ছিল। এই পুঁজির অর্ধেকটা আমি প্রথমত টং দোকানের ছোলাবুট অথবা গুড়ের মোয়ার পেছনে খরচ করতাম। অতঃপর বাসা থেকে পাঠানো খাবার খাওয়ার পর অবশিষ্ট অর্ধেক দিয়ে কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা আম বা অন্য কোন টক ফল কিনে খেতাম। দুপুরের এই সময় কিছুক্ষণ খেলাধুলাও করতাম।

মনে পড়ে গেলো, আমাদের ব্রাঞ্চ রোডের বাসার পাশে মায়মান গোত্রীয় ইউসুফ নামের একটি ছেলে ছিলো। একদিন সে আমাকে বললো, হাতখরচের জন্য প্রতিদিন সে চারআনা করে পায়! শুনে আমার চোখের পাতা যেন উল্টে গেলো! ভাবছিলাম, তার কাছে তো জীবন উপভোগ করার জন্য অনেক অনেক উপকরণ রয়েছে!

জ্বী হ্যাঁ! আজকে সে কথা মনে পড়লে আমার হাসি পায়। কথাটি শুনে আপনিও হয়তো মুচকি হাসছেন যে, চারআনার কীই-বা এমন মূল্য এবং এতে বিস্মিত হওয়ার কিংবা ঈর্ষা করার মতোই-বা কী আছে! আজ যে অর্থভাণ্ডার ও ধনসম্পদ নিয়ে আমরা ঈর্ষা করি এবং যা নিয়ে আমরা লড়াই-বিবাদ, হামলা-মামলায় মত্ত, একসময় আসবে যখন এই সব কিছু চারআনার চেয়েও তুচ্ছ মনে হবে। তখন হাসি আসবে, হায়! আমরা আসলে কিসের প্রতি দিল লাগিয়ে রেখেছিলাম! তখন এই উপলব্ধিও হবে যে, আল্লাহর কুরআন পূর্বে আমাদেরকে যা বলেছিলো তা কতোইনা সত্য ছিলো– وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور- (অর্থ:) পার্থিব জীবন ধোঁকা বৈ কিছুই নয়!

যাই হোক! এভাবেই আমার আরবীর প্রথম বছর শেষ হলো। দেখতে দেখতে বার্ষিক পরীক্ষা চলে এলো। সে বছর আমার ফলাফল ছিলো এমন– নূরুল ঈযাহ-৪৯, মীযান ও মুনশায়িব-৫১, আরবী কা মু'আল্লিম-৪৯, নাহবেমীর-৫১, দুরুসুল আদব-৪৯, শরহে মিয়াতে আমেল-৪৮, হেদায়াতুন্নাহব-৪৫, মুফীদুত্‌তালেবীন-৫০, পাঞ্জেগাঞ্জ-৪৮, ইলমুস সীগাহ-৫০, জামালুল কুরআন-৪৭, তাজবীদ-৫১, গণিত-৪৮, হস্তাক্ষর-৪১।

পরের বছরও (১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৪ ঈসাব্দে) আমাদের সব কিতাব হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ সাহেব রহ.-এর কাছেই ছিলো। কাফিয়া, নাফাতুল আরব, তাইসীরুল মানতেক, মেরকাত, শরহে তাহযীব আমরা হযরতের কাছেই পড়েছি। হযরতের পড়ানোর অভিনব পদ্ধতির সঙ্গে আমরা এতোটাই পরিচিত হয়ে গিয়েছি যে, অন্য কারো পড়ানোর পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের মুনাসাবাত হচ্ছিলো না।

গত বছর হযরতের কাছে নূরুল ঈযাহ পড়ার পর যখন এই বছর কুদুরী পড়ার সময় আসলো, তখন মাদরাসার কোনো প্রয়োজনে হযরতের পরিবর্তে তা অন্য উস্তাদের সোপর্দ করা হলো। কিন্তু আমাদের জামা'আতের ছাত্ররা, যাদের মধ্যে আমরা দুই ভাই ছাড়াও মাওলানা মুহাম্মদ আহমাদ সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুম (যিনি হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুখতার সাহেব শহীদ রহ.-এর বড় ভাই ছিলেন), মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব মুরাদাবাদী মুহাজিরে মাদানী রহ.-সহ আরও অনেক মেধাবী ছাত্র ছিল, তাদের কারোরই সেই দরসে মন বসছিলো না! উস্তাদ পরিবর্তনের দরখাস্ত পেশ করার প্রচলন তো তখন ছিলো না, কিন্তু বিভাগীয় দায়িত্বশীল নিজেই বিষয়টি টের পেয়ে সেই কিতাব হযরত মাওলানা আমীরুযযামান সাহেব কাশ্মীরী রহ.-এর কাছে সোপর্দ করেন। আর তাঁর সঙ্গে আমাদের পুরোনো সম্পর্ক থাকায় সবাই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলো।

**(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

**(৭ পৃষ্ঠার পর : নিজেকে জুড়ে রাখুন)**

সাম্প্রতিককালে আকাবিরদের রেখে যাওয়া উসূল বিনষ্ট করার জন্য এতায়াতী জামাত নামে এক বাতিল ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। সেখানেও কিছু মৌলবী সাহেব নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যক্তিপূজায় লিপ্ত রয়েছে। বর্তমানে ব্যক্তিপূজাও আকাবিরদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি যদি আল্লাহওয়ালা হন, তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কিন্তু আমাদের দেশে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সচরাচর ভারসাম্য থাকে না। কিছুদিন যেতে না যেতেই ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রথমে গড়ায় অতিভক্তিতে। অতঃপর অতিভক্তি উন্নীত হয় ব্যক্তিপূজায়। এই ব্যক্তিপূজার কারণেই জায়গায়-জায়গায়, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে ফেতনার দরজা-জানালা উন্মোচিত হতে থাকে। সুতরাং আমরা আমাদের বড়দের প্রতি পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখবো, কিন্তু কখনোই তা পূজায় পরিণত করব না।

আকাবিরের আদর্শ হল, প্রতিষ্ঠান কখনও তার শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করবে না। হযরত মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহ. তাঁর জীবদ্দশায় যখন শুনেছেন যে, জামি'আ রাহমানিয়ায় ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; তিনি বহু কষ্ট করে সেই যাত্রাবাড়ী থেকে রিক্সায় করে এখানে আসতেন এবং খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন। কথা প্রসঙ্গে বিভিন্নজনের কাছে বলতেন, 'পড়ালেখা তো হয় জামি'আ রাহমানিয়ায়' অথচ তিনি তখন যাত্রাবাড়ী মাদারাসার শায়খুল হাদীস। আজকে নিজেদের সামর্থ্যের দীনতা সত্ত্বেও আমরা আকাবিরের সেই ঐতিহ্য ও আদর্শ ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনারা যদি আকাবিরের আদর্শের উপর অটল থাকেন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আপনাদের মাধ্যমেই হককে বিজয়ী করবেন এবং বাতিলকে পরাভূত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সকলকে এ মহান দায়িত্ব পালনের পূর্ণ যোগ্যতা ও অবিচলতা দান করুন, আল্লাহুম্মা আমীন।

# স্মার্টফোন ব্যবহার: পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার উপায় আগেই ভেবে রাখতে হবে

## মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.

হামদ ও সালাতের পর...
প্রিয় আবনায়ে রাহমানিয়া ও সম্মানিত মেহমানবৃন্দ!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কতোটা উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং কতোটা ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলেম শব্দ ব্যবহার করার তাওফীক দান করেছেন– এ ব্যাপারে আমাদের সঠিক ইহসাস ও অনুভূতি নেই। সাধারণ মানুষ আমাদেরকে আলেম নামে সম্বোধন করে, সমাজ আমাদেরকে মুক্তাদা ও অনুসরণীয় মনে করে– এটা যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কত বড় এহসান এবং আমাদের জন্য কত বড় প্রাপ্তি, আমরা অনেক সময় তা ভুলে যাই।

এর কারণ সম্ভবত এই যে, আমরা অনেকেই এই নেয়ামত বিনা মেহনতে কিংবা নামকাওয়াস্তে মেহনতে পেয়ে গেছি। আমাদের আকাবির হযরতগণ যে সীমাহীন কষ্ট-সাধনা ও সুকঠিন তরবিয়ত-মুজাহাদার মাধ্যমে ইলম হাসিল করেছেন, আমরা তার সিকিভাগও করিনি, করতে পারিনি। ফলে আমরা নির্ভাবনায় সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেই এবং নির্দ্বিধায় যুগের হাওয়ায় উড়তে থাকি। এটা অনেকটা জন্মসূত্রে মুসলমান হওয়ার মতো। অর্থাৎ, যারা জন্মসূত্রে মুসলমান, ইসলাম গ্রহণে এবং ইসলাম পালনে যাদের কোন ত্যাগ ও কুরবানী নেই তাদের কাছে যেমন ইসলামের গুরুত্ব ও মূল্য নেই তেমনই আমরা যারা যথাযথ ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করে ইলম হাসিল করিনি তাদের কাছেও আলেমে দীন ও ফাযেলে দীন হওয়ার গুরুত্ব নেই।

মনে রাখতে হবে, আর দশজন করে করুক, জামি'আ রাহমানিয়ার কোন ফাযেল যেন যুগের হাওয়ায় উড়তে না থাকে, সময়ের স্রোতে গা এলিয়ে না দেয় এবং নির্বিচারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কামিয়াব হওয়ার ভুল ধারণার শিকার না হয়।

আমার ধারণা, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এখনো অনেক তালেব ও ফাযেলের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, দারুল উলূম করাচীতে মুফতী রফী উসমানী দা.বা. একবার তালিবে ইলমদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন, দারুল উলূমে এসে তোমরা কী পেয়েছো? বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছে। তিনি কোন উত্তরে সন্তুষ্ট হননি। অবশেষে নিজেই বলেছিলেন, 'দারুল উলূম তোমাদেরকে যে জিনিস দিতে চায়, সেটা হল ই'তিদাল তথা ভারসাম্য। অর্থাৎ, ই'তিদাল হল দারুল উলূম করাচীর মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। দীন ও দীনের প্রচার-প্রসার, বাতিলের মোকাবেলা, আমরে বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা দীনের সর্বক্ষেত্রে দীনের উসূল ও মূলনীতির অধীন থেকে ভারসাম্য বজায় রাখা দারুল উলূমের মূল মাকসাদ। এই দীর্ঘ সময়ে তোমরা যদি এটা হাসিল করে থাকো, তাহলে বলতে পারি, দারুল উলূমে তোমাদের আসা সার্থক হয়েছে।'

প্রিয় আবনায়ে রাহমানিয়া!

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া একদল বিজ্ঞ আসাতিযায়ে কেরামের মুখলিসানা মেহনত এবং কিছু আহলে দিল মুরুব্বীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে। এটারও কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে এবং আছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমার দৃষ্টিতে জামি'আ রাহমানিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো–

'ব্যক্তিগতভাবে দীন মেনে চলার ক্ষেত্রে এবং অন্যের মাঝে দীন প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন মত ও পথের পরিবর্তে আকাবিরের উসূল ও মূলনীতির অনুগামী থেকে নিজেদের কর্ম ও কর্মপন্থাকে নবীজীর হাতেগড়া শাগরেদ সাহাবায়ে কেরামের পুরনো কর্ম ও কর্মপন্থার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।'

জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি, 'মানুষ সব ব্যাপারে আধুনিকতা তালাশ করে। দুনিয়ার দিকবিচারে যে যতো সামনে এগোতে পারবে, সে ততো আধুনিক। পক্ষান্তরে দীনের দিকবিচারে যে যতো পেছনে যেতে পারবে, সে ততো আধুনিক!' এ হিসেবে আমরা যদি আমাদের আসাতিযায়ে কেরামের নকশে কদমে চলি তাহলে একটু আধুনিক হলাম; যদি আকাবিরের তরয ও তরীকায় চলি তাহলে আরেকটু আধুনিক হলাম; আর যদি আউলিয়ায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও তাবে তাবেঈনের সূত্র ধরে সাহাবায়ে কেরামের পুরানো নীতির উপর জমে যেতে পারি, তাহলে অতি আধুনিক হলাম!

বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করছি– জামি'আ রাহমানিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম মনেপ্রাণে কামনা করেন, এখানকার ফাযেলগণ যেন তা'মীলে দীন (দীন পালন) ও তাবলীগে দীনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের রীতিনীতির পরিপূর্ণ অনুসারী হয়ে যান। অর্থাৎ উক্ত দুই ক্ষেত্রে নিত্য নতুন মত ও পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে পেছনের দিকে চলতে থাকেন এবং চলতে চলতে সাহাবায়ে কেরামের সোনালী অতীতের অনুসারী হয়ে যান। যতটা সম্ভব বে-তাকাল্লুফ ও অনাড়ম্বড় জীবনে অভ্যস্ত হন। ইলমী গভীরতা ও আমলী উচ্চতার অন্বেষী হন। উম্মতের প্রতি সীমাহীন দরদ ও মহব্বত লালন করেন। এটাই জামি'আ রাহমানিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তাধারা। এর উপর যদি আমরা উঠে আসতে পারি তাহলে আবনায়ে রাহমানিয়ার এই সম্মেলন ও আয়োজন সব কিছুই সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ ।

প্রিয় আবনায়ে রাহমানিয়া!

আমাকে 'উলামায়ে কেরামের জন্য স্মার্টফোন ব্যবহারের জরুরত এবং নিরাপদ পন্থা' বিষয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, জরুরতের কারণে বিভিন্ন সময় আমাদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই জরুরত ও মাকসাদ এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা জরুরতকে মাকসাদের পর্যায়ে নিয়ে যাই। এটা বড় ধরণের ভুল।

দ্বিতীয় কথা হলো, মোবাইল ফোন এটা যামানার জরুরত। যারা নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা শেষ করে কর্মের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন, বলার অপেক্ষা রাখে

না, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের প্রয়োজনে তাদের জন্য মোবাইল ব্যবহার করা জরুরী। এসব ক্ষেত্রেও মোবাইল ব্যবহার না করলে আমরা এমন কিছু কষ্ট ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হবো, মোবাইল ছাড়া যেগুলোর বিকল্প নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমরা এসব ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহার করবো। কিন্তু মোবাইল ফোনের একটা বিশেষ শ্রেণী, যেটাকে আমরা স্মার্টফোন বলে জানি, এর মধ্যে এমন কিছু অতিরিক্ত অপশন রয়েছে, যেগুলোর কারণে সহজেই আমরা শয়তানের শিকারে পরিণত হয়ে যেতে পারি। এজন্য আমাদেরকে খুব ভালো করে চিন্তা করতে হবে যে, আমরা প্রয়োজনে মোবাইল তো ব্যবহার করবো, কিন্তু স্মার্টফোন ব্যবহারের আমাদের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না?

একটা প্রবাদ আছে الباحث عن حتفه بظلفه অর্থাৎ একলোক গাছের গোড়ায় ছাগল বেঁধে যবাই করার জন্য ছুরির তালাশে বের হলো। কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করে যবাই করার মতো কিছু না পেয়ে ফিরে আসল। এদিকে ছাগলটা তার পা দিয়ে গাছতলার মাটি খুঁড়ে একসার। মালিক লক্ষ্য করল, ছাগলের পায়ের তলায় কী যেন চিকচিক করছে। তুলে দেখল মস্ত এক ছুরি। ব্যস, তার আর পেরেশানী পোহাতে হলো না; ছাগলের বের করা ছুরি দিয়েই ছাগলটাকে যবাই করে দিলো। তো যারা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করছে, তাদের অধিকাংশের জন্য এই প্রবাদ অত্যন্ত লাগসই। শয়তানের পাল্লায় পড়ার জন্য, গুনাহের কাজ করার জন্য তারা নিজ হাতে গুনাহের সামান সংগ্রহ করেছে।

এখন কথা হলো, যাদের শুধু যোগাযোগের জন্য মোবাইল ব্যবহার করতে হয়, তাদের তো স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও কেউ যদি স্মার্টফোন ব্যবহার করে, তাহলে নিজের উপর তার এতটুকু আস্থা থাকতে হবে যে, এর মধ্যে গুনাহের যে সহজ পথগুলো আছে, সেগুলোতে সে কিছুতেই প্রবেশ করবে না। কিন্তু বলুন, এটা কয়জনের পক্ষে সম্ভব? কে নিজের উপর এতোটা আস্থা রাখতে পারে যে, গুনাহের সামান হাতে থাকা সত্ত্বেও সে গুনাহ করবে না! এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ আস্থা তো আমাদের আকাবিরগণও নিজেদের ব্যাপারে রাখতেন না। তাহলে হে আবনায়ে রাহমানিয়া! আমরা কিভাবে নিজেদের উপর এতোটা আস্থা রাখি যে, স্মার্টফোন ব্যবহার করা সত্ত্বেও আমরা এর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো! উপরন্তু এর সঙ্গে যদি নেটওয়ার্ক সংযোগ থাকে, ফেসবুক, ইউটিউব লগইন করা থাকে, তাহলে তো নিজেকে সর্বনাশের কিনারায় পৌঁছে দেয়া হলো। কেউ বলতে পারেন, নেট কানেকশন থাকলে আমি বিভিন্ন জায়গার দূরত্ব দেখতে পারবো, উবার, পাঠাও অ্যাপ ব্যবহার করে সহজে মোটরসাইকেল, টেক্সিক্যাব ভাড়া করতে পারবো। কিন্তু বলুন, এতটুকু সুবিধার জন্য কি এতগুলো গুনাহের আশংকা বয়ে বেড়ানোর অনুমতি দেয়া যায়?

আজকে যারা দেদারসে স্মার্টফোন ব্যবহার করছে এবং যারা কোন মুরুব্বীর তত্ত্বাবধানে নিজেকে এতটুকু পরিশুদ্ধ করে নেয়নি যে, গুনাহের সামান সামনে থাকা সত্ত্বেও নির্জনে কিংবা জনতার মাঝে নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে, তাদের প্রতি কু-ধারণাবশত নয়, আত্মসমালোচনার জন্য বলছি, আমার ধারণা, এদের শতভাগ এর মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত। এরা এমন এমন গুনাহে লিপ্ত– যেগুলোর খবর সাথী-সঙ্গীরা জানে না, ভক্তবৃন্দ জানে না, এমনকি অনেক সময় এটা যে গুনাহ গুনাহকারী নিজেও তা জানে না। মনে রাখতে হবে, কেউ না জানলেও আল্লাহ তা'আলা তো জানেন, কেউ না দেখলেও আল্লাহ তা'আলা তো দেখেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার শিক্ষকতার বয়স তেইশ বছর চলছে। স্মার্টফোন সহজলভ্য হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি বারবার ভেবে দেখেছি, আমি এটা ব্যবহারের উপযুক্ত নই। ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব এগুলোকে আমি বিলকুল জরুরী মনে করি না। এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবো এ ব্যাপারে আমার সামান্যও আস্থা নেই। এ কারণে এখনও পর্যন্ত আমি স্মার্টফোন থেকে দূরে রয়েছি। আমি যে মোবাইলটি ব্যবহার করি, তার মধ্যে মেমোরী কার্ডও এন্ট্রি করিনি; ইন্টারনেট কানেকশন তো পরের কথা! একবার কয়েকজন সাথীর প্রবল উৎসাহে নেটবান্ডিল ক্রয় করেছিলাম। তারা বলেছিলো, এর দ্বারা কিতাব ডাউনলোড করা যায়, কিতাব মুতালা'আ করতে সহজ হয় ইত্যাদি। কিন্তু নেট কানেকশন নিয়ে কিতাব ডাউনলোড করা দূরের কথা, কয়েক দিনের মধ্যেই গুনাহের যত সহজ উপকরণ এতে আছে, আমার চাক্ষুষ হয়ে গেছে! কী আশ্চর্য, কানেকশন দিয়ে কোন অ্যাপ খোলামাত্রই বেগানা নারীর ছবি চলে আসে। উলঙ্গপনা, বেহায়াপনার সমস্ত উপকরণ সেখানে একপেয়ালায় জমা করে দেওয়া হয়েছে।

বলছিলাম, আমার বিবাহের বয়স হয়ে গেছে বাইশ বছর, আর শিক্ষকতার একুশ। এই অবস্থায়ও আমি ভেবে দেখলাম, আমার দ্বারা এই জিনিস ব্যবহার করে নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং নেট কানেকশন, ওয়েবসাইট সব কিছু বাদ দিয়েছি। আবনায়ে রাহমানিয়াকেও বলবো, সামান্য উপকারের জন্য, পাঠাও আর উবার সেবা গ্রহণের জন্য, মাকতাবায়ে শামেলা ইত্যাদি থেকে ইস্তেফাদার জন্য আপনার যদি নেট ব্যবহার করা দরকার মনে হয় তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়টা কী হবে, ব্যবহারের আগে সেটাও ঠিক করে নিবেন।

দেখা গেছে, এ ধরনের সেট যারা ব্যবহার করে, আলেম হওয়ার কারণে তারা নিজেরা হয়তো কিছুটা সংযমের সাথেই ব্যবহার করে, কিন্তু তার সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজন এর ভুল ব্যবহারে লিপ্ত হয়। বড়দের অনেকের ব্যাপারে এ ধরণের কিছু তথ্য আমার জানা আছে। অনুরূপভাবে যে সকল মুরুব্বী উলামায়ে কেরাম স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, দেখা গেছে, তারা এর অপশনগুলো সম্পর্কে বিলকুল অবগত নন। আমার পরিচিত একব্যক্তি মিশর থেকে ফেরআউনের ছবি তুলে এনেছেন। কানাডা থেকে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ছবি তুলে এনেছেন। কিন্তু এটা কিভাবে দেখতে ও দেখাতে হয় তা তিনি জানেন না। অর্থাৎ তিনি ব্যবহার করছেন ঠিক, কিন্তু এর বিভিন্ন অপশন সম্পর্কে তার জানা নেই। অথচ ছোট্ট বাচ্চা, যার বয়স এখনো তিন পেরোয়নি, দশ সেকেন্ডের মধ্যে কোথায় কি আছে বের করে ফেলে। মোটকথা, মুরুব্বী তো গুনাহ থেকে বেঁচে তাঁর প্রয়োজনীয় অপশনটুকুর মধ্যে নিজের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু যার মোটেও দরকার নেই সেই শিশু স্মার্টফোনের 'হাফেয' হয়ে গেছে। তো সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজনের দীনী মেজায ও ধর্মীয় চেতনা ধরে রাখতে হলে এটাকে সযত্নে পরিহার করতে হবে।

কিছু লোকের ধারণা, স্মার্টফোন দ্বারা উবার-পাঠাও ভাড়া করা, কিতাব ডাউনলোড ও মুতালাআ সহজ হওয়ার পাশাপাশি দীনও প্রচার করা যায়! এর

দ্বারা আসলে দীন কতটুকু প্রচার করা যায় তা আল্লাহই ভালো জানেন, কিন্তু এই রকম দীন প্রচার এখানো আমাদের বুঝে আসেনি। ধরে নিলাম, যারা প্রচার করে তারা ভালো কাজে লিপ্ত, কিন্তু প্রশ্ন হলো, যারা স্মার্টফোনের মাধ্যমে সেই দীনী সেবা গ্রহণ করে তারা কতটুকু লাভবান হয়! তারা তো দীনী প্রোগ্রাম যতটুকু শোনে, তার চেয়ে বেশি বদদীনের দাওয়াত গ্রহণ করে। এটা এমনিতেই বলছি না, বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি।

এরপরও কিছু লোকের জন্য দীনী কাজ সহজ করণার্থে স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ যেসব বুযুর্গানে দীনের তা'আল্লুক মা'আল্লাহ এতোটাই শক্তিশালী যে, লোকালয়ে কিংবা লোকান্তরে কোনখানেই শয়তান তাদের কাছে মওকা পাবে না এবং তাঁদের ইলম ও ফয়েয দ্বারা সব লাইনেই উম্মতের উপকৃত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁদের জন্য এই লাইনে কাজ করা মানায়।

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব দা.বা. যখন প্রথমবার এখানে আসেন, একেবারে খালি ময়দানে, একটা ইটের উপর দম করে দিয়েছিলেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন তিনি ক্যামেরা ও মেমোরী কার্ড বিহিন একটা সেট ব্যবহার করছিলেন। তার সেটটি একপর্যায়ে চার্জে লাগানো হলে তাকে বিকল্প একটা সেট পেশ করা হলো। তিনি বললেন, اسمیں کیمرا ہے؟ اسمیں میموری کارڈ ہے؟ (এর মধ্যে কি ক্যামেরা, মেমোরী কার্ড আছে?) তার মেজবান মাওলানা সাহেব বললেন, না হযরত! এর মধ্যে ক্যামেরা, মেমোরী কার্ড নেই। তিনি বললেন, ہم کیمرا والا اور میموری کارڈ والا سیٹ استعمال نہیں کرتے۔ (আমরা ক্যামেরা ও মেমোরী কার্ড বিশিষ্ট মোবাইল ব্যবহার করি না।

এটা ছিল দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম আবুল কাসেম নোমানী সাহেব দা.বা.-এর তখনকার কথা। পরবর্তীকালে জরুরতের কারণে তাঁকেও হয়তো নেট কানেকশন আছে এমন স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হচ্ছে। আমরা মনে করবো, এটা তিনি জরুরতের কারণেই করছেন। সুতরাং আমাদের মেজায প্রথমত এটাই হবে যে, আমরা ক্যামেরা, মেমোরী কার্ড ও নেট কানেকশনওয়ালা মোবাইল ব্যবহার করব না। এই মেজায ও নীতির উপর বহাল থেকে অতঃপর যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে ব্যাপারে আমার মুরুব্বীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবো। মুরুব্বী যদি সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমাকে অনুমতি দেন, তখন সে পথে পা বাড়াবো; এর আগে নয়।

আমার ক্ষুদ্র নজরে স্মার্টফোন ব্যবহারের যেসব সমস্যা ও ক্ষতি ধরা পড়েছে, তার কয়েকটি এই–

**এক. নিজেকে গুনাহের আশংকায় ফেলা।** নিজেকে গুনাহের আশংকায় নিক্ষেপ করা যে একটা ভয়ানক ব্যাপার, আপনাদেরকে এটা দলীল-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর দরকার মনে করছি না। আপনারা সকলেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবগত।

**দুই. অপরকে কুধারণার সুযোগ করে দেয়া।** আমরা যারা আলেম হিসেবে পরিচিত, মানুষ যখন আমাদের হাতেও এমন সব মোবাইল দেখতে পাবে, যেগুলো দিয়ে তারা নিজেরা নানা রকম পাপাচার ও নোংরা কাজে লিপ্ত হয়, তখন ভাববে, হুযূরও মনে হয় আমাদের মতো এসব অনাচার পাপাচারে লিপ্ত। সুতরাং আমি যদি ভালোই থাকি, তাহলে কেন খামাখা অপরকে কুধারণা করার সুযোগ দিবো? এ ব্যাপারে হযরত উমর রা.-এর এই উক্তিই আমাদের জন্য যথেষ্ট– من اقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن من اساء الظن به. (অর্থ:) কেউ যদি নিজেকে অপবাদ আরোপযোগ্য কোথাও উপস্থিত করে এবং অতঃপর কেউ তার ব্যাপারে কুধারণা করে তাহলে সে যেন ঐ কুরধারণাকারীকে তিরস্কার না করে। বরং নিজেকেই যেন তিরস্কার করে যে, কেন সে এমন জায়গায় নিজেকে উপস্থিত করলো?

**তিন. ছবি তোলার গুনাহে লিপ্ত হওয়া।** ছবি তোলার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি এখন এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে, নিজেদের বয়ান-বিতর্কে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে ডিজিটাল ছবি হারাম প্রমাণ করে পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সে নিজেও ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে প্রাণীর ছবি তুলছে! নিজের মোবাইলে প্রাণীর ছবি সেভ করে রাখছে!!

একবার এক মাওলানা সাহেব, যিনি প্রায় বিশ বছর আগে আমাদের এখান থেকে ইফতা কোর্স সমাপন করেছেন, আমি তার পাশে বসে খানা খাচ্ছিলাম। লক্ষ করলাম, যেই-না তার মোবাইলে কল আসে, অমনিই স্ক্রীনে একটা ছবি চলে আসে। কয়েকবার এরূপ দেখার পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মোবাইলে ছবি আসে কেন? বলল, হুযূর! ইমো চালু আছে তো, এজন্য যারা ফোন দেয় তাদের ছবি চলে আসে। ঠিক আছে, ইমো চালু থাকার কারণে যারা ফোন দেয় তাদের ছবি চলে আসে! কিন্তু এই ফোনদাতাদের মধ্যে তার মহিলা মুসতাফতী (মাসআলা জিজ্ঞেসকারী) থাকতে পারে, অনুরূপভাবে তার গায়রে মাহরাম আত্মীয়ারা থাকতে পারে! এছাড়া অন্যান্য গায়রে মাহরামও থাকতে পারে, যাদের নাম-নম্বর তার মোবাইলে সেভ করা আছে। সুতরাং তার কথা সত্য হয়ে থাকলে ঐ মহিলারা ফোন দিলেই তো সে তাদের চেহারা দেখে ফেলবে। আর যদি ব্যাপারটি সে রকম না হয়, বরং ডিসপ্লেতে তার স্ত্রীর/কন্যার ছবি থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা আরও বিদঘুটে হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কেউ কল দিলেই স্ক্রীনে স্ত্রী/কন্যার ছবি ভেসে উঠবে এবং অন্য কেউ পাশে থাকলে সে-ও দেখে ফেলবে! তো একজন আলেমে দীন, মাদরাসার মুহতামিম, বুখারী শরীফের উস্তাদ, ওয়াযের মৌসুমে দিন খালি থাকে না– এমন লোকের মোবাইলে যদি প্রতিটি কলেই কলদাতা বা তার সেভ করা ছবি ভেসে উঠে, তাহলে সাধারণ মানুষজনের অবস্থা কী হবে? আপনারা যারা মাত্র এক/দুই বছর আগে ফারেগ হয়েছেন তাদের অবস্থাই-বা কী হবে? মোটকথা, স্মার্টফোন ব্যবহার করলে বাধ্য হয়ে কিংবা শখের বশে ছবির গুনাহে লিপ্ত হতে হয়।

**চার. বেহুদা কাজে সময় নষ্ট করা।** আপনি খবর ইত্যাদি দেখবেন বলে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়েছেন, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। কিন্তু খবর দেখতে গেলে যে তার সাথে কতশত এগানা-বেগানার ছবি দেখতে হয় সেটা কি একবারও ভেবে দেখেছেন! তাছাড়া খবরগুলোও এমনভাবে সাজানো থাকে যে, দেখতে দেখতে ফজর হয়ে যাবে, খবরের ধারাবাহিকতা শেষ হবে না। আর খবরও এমন চটকদার যে, অবুঝ শিশু সাপ নিয়ে খেলছে, সাপ তাকে দংশন করছে না। আবার মানুষের অর্ধেক সাপ কিংবা অর্ধেক মাছ হয়ে গেছে ইত্যাদি। বস্তুত এগুলো একবার শুরু করলে শেষ করার জো থাকে না।

তো এই যে শুধু খবর দেখার জন্য নেট সংযোগ চালু করা হলো, এখন এই খবর দেখতে দেখতে আমার যে মহামূল্য সময়ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়টাও তো খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য সতর্কতার দাবী হলো, এগুলো থেকে বেঁচে থাকা।

‘লাভবান হওয়ার চেয়ে লোকসান ঠেকানো অগ্রগণ্য’ এই স্বর্বস্বীকৃত মূলনীতির আলোকেই স্মার্টফোনের উপকারের বিপরীতে ক্ষতির দিকটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের আকাবিরদের তরয তরীকা এরকমই ছিল। হযরত থানভী রহ. অনেক মাসআলায় জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজতার ফাতওয়া দিতেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সেগুলোর উপর আমল করতেন না। আমাদেরকেও এই পথ অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য বৈধতার ফতওয়া দিলেও সেটা নিজের দীনী খাতরা বা অন্যের বদগুমানীর কারণ হলে তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

এতদসত্ত্বেও কারও যদি মনে হয় যে, তার স্মার্টফোন ব্যবহার করার কিংবা নেট কানেকশন গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে আমরা তাকে পরামর্শ দেবো বরং আবনায়ে রাহমানিয়া হিসেবে নির্দেশ করবো যে, আপনি আপনার শায়েখ ও মুরুব্বীর কাছে নিজের অবস্থা সবিস্তারে তুলে ধরুন যে, আমি এতদিন সাধারণ ফোন ব্যবহার করে আমার জরুরত পুরো করছিলাম, এখন আমার এই এই কারণে স্মার্টফোন ব্যবহার করা বা নেট কানেকশন নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এরপর যদি আপনার শায়েখ আপনাকে পরামর্শ দেন, তবেই প্রয়োজন অনুপাতে স্মার্টফোন ব্যবহার করুন। কিন্তু আপনি আপনার শায়েখের সঙ্গে পরামর্শ না করে, নিজেই নিজেকে স্মার্টফোন ব্যবহারের উপযুক্ত মনে করলেন, বুঝতে হবে, আপনি বড় একটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আর আমাদের যে সকল মুরুব্বী স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের দ্বীধাহীন আস্থা রয়েছে যে, তারা শরয়ী নীতিমালা মেনেই তা ব্যবহার করেন। সুতরাং আমরা যেন নিজেদেরকে বড়দের সমপাল্লার ভেবে না বসি।

এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত কবিতা বড়ই চমকপ্রদ–

کار پاک آں را قیاس از خود مگیر،
ہمچوں باشد در نوشتن شیر و شیر۔
شیر آں باشد کہ مردم میخورند،
شیر آں باشد کہ مرداں راخورد۔

(অর্থ:) নেককার বুযুর্গদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করো না, যদিও شیر (শের) ও شیر (শীর) লিখতে একই রকম। ‘শীর’ (দুধ) হলো সেই জিনিস যা মানুষে খায়, আর ‘শের’ (বাঘ) হলো সেই জিনিস যে মানুষকে খায়।

সুতরাং বড়দের সঙ্গে নিজেদেরকে তুলনা করে একথা বলা বিলকুল বোকামীপ্রসূত যে, অমুক শাইখুল হাদীস সাহেব বা অমুক মুফতী সাহেব তো ব্যবহার করেন, তো আমরা ব্যবহার করলে অসুবিধা কী? কেননা কাগজে লেখা শের (বাঘ) ও শীর (দুধ) চোখের দেখায় একই রকম মনে হলেও শক্তি ও বৈশিষ্ট্যে দু'টো এক নয়; একটা মানুষে খায়, আরেকটা মানুষকে খায়। একজন আল্লাহওয়ালা মুরুব্বী কোন একটা জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োজনের সীমায় অটল থাকবেন, আমি যে সে সীমানা অতিক্রম করে গুনাহের গণ্ডিতে প্রবেশ করবো না, এই নিশ্চয়তা কিন্তু আমার নেই। সুতরাং আমি আমার নফসকে পবিত্র মনে না করে, নফসের উপর আমার আশংকার কথা খেয়াল রেখে স্মার্টফোন থেকে বেঁচে থাকবো। জরুরত হলে আমার খাস মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করে তার অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করবো, অনুমতি না দিলে ব্যবহার করবো না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভরপুর তাওফীক দান করুন! আমীন!!

অনুলেখক: মাওলানা জামালুদ্দীন গোপালগঞ্জী
শিক্ষক: জামি'আতুস সুন্নাহ, শিবচর, মাদারীপুর

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ
প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমাতুল্লাহ
সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন
পাথর ও সিলেকশন বালু
সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
এল.সি কালো পাথর
আমদানীকারক
এল.সি. কালো পাথর, সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।
ঢাকা অফিস
হাউজ # ৩/৩/১৫, রোড # ৪
চাঁনমিয়া হাউজিং, বাঁশবাড়ি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০১৭১৬৭১০৭১১, ০১৮৭৬০০৩৫১৮
ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

সাক্ষাৎকার

# অমুসলিম ঘোষণা : কাদিয়ানী বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ

## ‘রাষ্ট্রের কাছে তো ফতওয়া চাওয়া হচ্ছে না, রাষ্ট্রীয়ভাবে শুধু ঘোষণাটা চাওয়া হচ্ছে।’

*কাদিয়ানী ধর্মের ভেতরগত নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে হযরত মাওলানা আবু সালমান সাহেবের সাথে। তিনি ঢাকার বিশিষ্ট দাঈ ও কাদিয়ানী বিশেষজ্ঞ আলেম। অনেক দিন যাবৎ তিনি দেশের কাদিয়ানী ফেতনা নিয়ে কাজ করছেন। এদের স্বরূপ দেখতে এবং মুসলমানদেরকে সচেতন করতে সফর করেছেন দেশের প্রায় সবগুলো জেলায়। কাদিয়ানী ধর্মের উপর তার রয়েছে বিস্তর পড়াশোনা ও গবেষণা। এ সাক্ষাতকারে উঠে এসেছে কাদিয়ানীদের জানা-অজানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিজ্ঞ এ আলেম ও দাঈর সাথে কথা বলেছেন তরুণ আলেমে দীন মাওলানা সাবের চৌধুরী।*

**সাবের চৌধুরী :** কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি অবগত। এজন্য সেদিকে না গিয়ে একটু ভেতরের কিছু বিষয় জানতে চাইবো। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে নানা রকমের দাবি করেছেন। নবুওয়াতের দাবিটা ঠিক কখন করেছেন এবং এর ধরণটা কী ছিল?

**আবু সালমান :** মির্যা কাদিয়ানী প্রথমেই নবুওয়াতের দাবি করেনি। ১৮৮০ সন থেকে তার দাবির ধারাবাহিকতা শুরু হয়। প্রথমে দাবি করে মুজাদ্দিদ, মুলহাম, মামুর মিনাল্লাহ ইত্যাদি। তার জীবনের প্রথম বড় কিতাব, যার ব্যাপারে সে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালিয়েছিলো, সে কিতাবে সে দাবি করে যে, কারো কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইলহাম হতে পারে এবং ইলহাম অকাট্য ও সংশয়হীন। এখান থেকে মূলত তার একটা প্ল্যান ছিল যে, একসময় সে নবুওয়াত দাবি করবে। ১৮৯১ সন থেকে তার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, যখন সে মাহদী এবং মাসীহ ইবনে মারইয়াম হওয়ার দাবি করে। ‘বারাহীনে আহমদিয়্যাহ’তে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরায় আগমনের কথা স্বীকার করলেও এ পর্যায়ে এসে তা প্রত্যাখ্যান করে। তার নতুন সিদ্ধান্ত হলো– হযরত ঈসা আসবেন না; মারা গেছেন। তার স্থলে এসেছি আমি মাসীহ ও মাহদী হয়ে। তখন দিল্লীসহ কোন কোন এলাকার আলেমগণ তার উপর কুফুরের ফতওয়া দেন। তখন সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, আমি নবুওয়াত দাবি করিনি। বরং এমন দাবি যে করবে তাকে আমি কাফের মনে করি।

১৮৯১ সনে মির্যা কাদিয়ানী একটি কিতাব লেখে ‘ইযালায়ে আওহাম’ নামে। এ কিতাবের অনেক জায়গায় সে বলেছে– আল্লাহর রাসূল শেষ নবী, তারপরে কোন নবী হতে পারে না। অন্য এক কিতাবে বলেছে– যে নবী হওয়ার দাবি করবে সে কাফের। ওহীর দরজা বন্ধ। অবশ্য সেখানেও কিছু ফাঁক রেখে দিয়েছিল। বলেছিল, নবী না হলেও কেউ মুহাদ্দাস হতে পারে। আর মুহাদ্দাস শক্তি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে নবীর মত। এরপর তৃতীয় পর্যায়টা শুরু হয় ১৯০১ সন থেকে। এ বছর সে নবুওয়াত দাবি করে এবং তার মুরীদদের থেকে যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে না, তাদের ভুল সংশোধন করে দেওয়ার জন্য ‘এক গলতি কা ইযালা’ নামে একটা বইও লেখে।

**সাবের চৌধুরী :** নবুওয়াত দাবি করতে গিয়ে সে কখনো যিল্লী নবী বা বুরুযী নবী হওয়ার কথাও বলেছে।

**আবু সালমান :** হ্যাঁ, এগুলো অনেকটা প্রটেকশনের মতো। ইসলামে যিল্লী বা বুরুযী-এর কোন ভিত্তি নেই।

**সাবের চৌধুরী :** যিল্লী বা বুরুযী দিয়ে সে আসলে কী বুঝাতে চেয়েছে?

**আবু সালমান :** এটা মির্যা কাদিয়ানীর একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। সে বুঝাতে চায়– মির্যা কাদিয়ানীর নবুওয়াতটা তার নিজস্ব কোন নবুওয়াত নয়; বরং সে হুবহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। নাউযুবিল্লাহ। এক গলতি কা ইযালাহ, যার বাংলা অনুবাদ ‘একটি ভুল সংশোধন’ নামে বকশি বাজার থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এর ৪র্থ পৃষ্ঠায় এটা আছে। সেখানে সে বলেছে– কুরআনুল কারীমের مُّحَمَّدٌ رسول الله والذين أمنوا معه أشداء আয়াতটি আমার উপর নাযিল হয়েছে এবং এখানে مُّحَمَّدٌ رسول الله বলে বুঝানো হয়েছে আমাকে। এমনকি এ কথাও বলেছে– আমি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে বিলীন হয়ে একদম এক হয়ে একেবারে তার ‘যিল্ল’ (ছায়া) হয়ে গেছি। যার কারণে তার গুণাবলী, চরিত্র সবকিছু যেমন আমার কাছে এসেছে, তেমনি তার নবুওয়াতটাও আমার কাছে এসেছে।

এই হলো তার আবিষ্কৃত ‘যিল্লী নবুওয়াত’ এর অর্থ। মির্যা কাদিয়ানীর ছেলে মির্যা বশীর ‘কালিমাতুল ফসল’ কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেছে– যিল্লী নবুওয়াত কোন নিম্নস্তরের নবুওয়াত নয়। বরং সকল নুবওয়াতের মাথার মুকুট। এর কারণে মির্যা কাদিয়ানীর মর্যাদা হুবহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান।

আর, বুরুযী নবী দিয়ে বুঝাতে চায়– সে আল্লাহর রাসূলের দ্বিতীয় প্রকাশ। বুরুয মানে হলো প্রকাশ। এই আকীদাটি কাদিয়ানীদের কাছে ‘বি'ছাতে সানিয়া’ বা দ্বিতীয় প্রেরণ নামে প্রসিদ্ধ। মির্যা কাদিয়ানী স্পষ্টভাবে বলেছে, যে আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে ব্যবধান করবে, সে আমাকে চিনেনি। (খুতুবাতে ইলহামিয়া, রূহানী খাযায়েন-১৬:২৫৮)

**সাবের চৌধুরী :** এটা তো হিন্দুদের পুনর্জন্মের বিশ্বাসের মত হয়ে গেল। মির্যা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরা কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে?

**আবু সালমান :** এরা এই শব্দ স্বীকার করে না। কিন্তু, তাদের বক্তব্য থেকে তো এটাই বুঝে আসে। এ কারণে উলামায়ে কেরাম বলেন, মির্যা কাদিয়ানীর মধ্যে হিন্দুদের মত পুনর্জন্মের বিশ্বাসও ছিল।

**সাবের চৌধুরী :** মির্যা কাদিয়ানী নানা সময়ে নিজের ব্যাপারে নানা কিছু হওয়ার দাবি করেছে। তো, বর্তমানের কাদিয়ানী মতবাদে বিশ্বাসী লোকজন তাকে ফাইনালি কী হিসেবে মানে?

**আবু সালমান :** এখানে দুটো বিষয়। মানার বিষয় ও প্রকাশের বিষয়। ওরা কিন্তু নবী হিসেবেই মানে, কিন্তু এটা প্রকাশ করে না। তাদের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি, প্রচার, ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে দেখবেন, টাইটেলে এরা কখনো তাকে

নবী হিসেবে উল্লেখ করে না। শুধু ঈসা ও মাহদী হিসেবে দেখায়। বিভিন্ন বইয়ের শুরুতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নীচে লেখে 'প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মাহদী'। কিন্তু ভেতরে গেলে আপনি পাবেন। এ পর্যন্ত অনেক কাদিয়ানীর সাথে আমার কথা হয়েছে। মুআল্লিম পর্যায় থেকে নিয়ে সাধারণ কাদিয়ানী পর্যন্ত। দেখা যায়, শেষমেশ তারা এটা জানে যে, মির্যা নবুওয়াত দাবি করেছে এবং বাস্তবে তারা মানেও; কিন্তু প্রথমে তারা এটা স্বীকার ও প্রচার করে না।

তারা বলে, আমরা ইমাম মাহদী ও মাসীহ বলে মানি। পঞ্চগড়ে একজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে শেষে যখন নবুওয়াত দাবি করেছে মর্মে রেফারেন্স দিলাম, তখন সে বললো এটা যিল্লী ও বুরুযী নবী। অর্থাৎ বুঝাতে চায় যে, এটা আসলে সত্যিকার অর্থে নবুওয়াতের দাবি না। বিষয়টা তারা হালকা করে লুকিয়ে ফেলতে চায়। পাকিস্তানে যখন তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার মামলা উঠলো, তখনও তারা এ কথা বলে লুকাতে চেয়েছে। কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল তাদের রেফারেন্স থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই যে যিল্লী আর বুরুযী বলছো, তোমাদের কাছে এটা অনেক উঁচু স্তরের নবুওয়াত; অন্য কোন নবী যার হকদার ছিলেন না। তারা যখন কাউকে দাওয়াত দেয়, তখনও এই পলিসি গ্রহণ করে। নবুওয়াতের কথাটা স্বীকার করে না। প্রশ্ন তুললে বলে দেয়– এটা আলেমদের মিথ্যা প্রচার। অনেকের সাথে আমার দেখা হয়েছে, যারা প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং নবুওয়াত দাবি করার বিষয়টি জানেই না। তাদের থেকে ইচ্ছে করেই গোপন রাখা হয়। এরপর যখন তাকে ভ্রান্তির গভীরে নিয়ে যায়, তখন প্রকাশ করে; কিন্তু সে সময় আর এই ব্যক্তির ফিরে আসার অবস্থা থাকে না। কারণ, ততদিনে সে ওয়াশড হয়ে গেছে এবং তাদের নানা কুসংস্কার পালনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

**সাবের চৌধুরী :** ওরা যে ভেতরে ভেতরে আসলে তাকে নবী হিসেবে মানে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হবো কী করে?

**আবু সালমান :** দেখুন, ওদের লেখা অনেক বই আছে এ ব্যাপারে। উদাহরণ স্বরূপ আমি কয়েকটা রেফারেন্স বলি। বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের মূল কেন্দ্র ঢাকার বকশি বাজার থেকে প্রচারিত হয়েছে 'এক গলতি কা ইযালা'র তরজমা 'একটি ভুল সংশোধন' নামে। পেছনে বলেছি, বইটা মির্যা রচনাই করেছিল নিজের নবুওয়াত প্রমাণ করার জন্য। 'দাফেউল বালা' গ্রন্থটিরও বাংলা বের হয়েছে। এর ১২নং পৃষ্ঠায় আছে, সত্য খোদা তিনি যিনি কাদিয়ান গ্রামে তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন। আরেকটা বই আছে– নুবওয়াত ও খেলাফত। এর ৭৭নং পৃষ্ঠায় মির্যার বড় ছেলের রেফারেন্সে আছে– 'সারা জগতকে জানিয়ে দাও কাদিয়ানে আল্লাহর রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন। তার নাম মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।' এটা ওদের মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা এটা প্রকাশ করে না, কারণ মুসলিম সমাজের সামনে তারা সাহস করে না। তাছাড়া যাকে দাওয়াত দিচ্ছে প্রথমেই সে এটা মানতে চাইবে না।

**সাবের চৌধুরী :** কাদিয়ানী ইস্যুটি জনপরিসরে সাধারণত খতমে নবুওয়াতের সূত্রে আলোচিত হয়। খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি ছাড়া কাদিয়ানী মতবাদের উপর শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আর কী কী আপত্তি আছে এবং সেগুলো কোন পর্যায়ের?

**আবু সালমান :** খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি ছাড়াও নানা রকমের ও নানা পর্যায়ের অনেক আপত্তিকর বিষয় আছে। ফলে, এক মিনিটের জন্য যদি ধরেও নেই তারা খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করে না, তবুও তারা নানা কারণে কাফের থেকে যায়। এই স্বল্প পরিসরে আসলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, নবীগণের শানে গোস্তাখী ও বেয়াদবী। বিশেষ করে ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে। একটা উদাহরণ, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র চন্দ্রগ্রহণের মাধ্যমে তার মুজিযা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমার মুজিযা প্রকাশ করেছেন চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির গ্রহণের মাধ্যমে। এরপরেও তোমরা আমাকে কিভাবে অস্বীকার করো? (এ'জাযে আহমদী, রূহানী খাযায়েন-১৯:১৮৩)

এরপর আরেক জায়গায় সে দাবি করেছে, তার আধ্যাত্মিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিকতার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। (খুতুবাতে ইলহামিয়া, রূহানী খাযায়েন-১৬:২৭১ ও ৭২) এই কথাগুলো তো স্বয়ংসম্পূর্ণ কুফুরী। এরপর, তাযকেরা কিতাবের ৫১৯নং পৃষ্ঠায় মির্যা ঘোষণা দিয়েছে, তাকে নবী হিসেবে মানে না এমন সকল মুসলমান কাফের। সে তার মুরিদ ড. আবদুল হামিদ খানকে দল থেকে বের করে দিয়েছে শুধু এই আকীদাটি না মানার কারণে। (কালিমাতুল ফসল-৩৫) এবং কাদিয়ানীদের আকীদাও এটা। এর সাথে আছে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা।

**সাবের চৌধুরী :** আমরা জানি, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নানা রকম জটিল রোগে জীবনভর আক্রান্ত ছিলেন। এমন সম্ভাবনা কি আছে যে, তিনি কোন রোগের কারণে 'গায়বী' আওয়াজ শুনে বিভ্রান্ত হতেন?

**আবু সালমান :** তার জটিল জটিল নানা রোগ ছিল। এর মধ্যে একটা রোগ ছিল, উর্দুতে যাকে মারিক বা মালিখুলিয়া রোগ বলা হয়। বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় মস্তিষ্কবিকৃতি। তো, তার নানা উদ্ভট দাবি দাওয়া ছিল। যেমন মারয়াম হওয়ার দাবি। (হাকিকাতুল ওহী, বাংলা-৬২) এমনকি সে গর্ভবতী হওয়া ও গর্ভপাতের দাবি পর্যন্ত করেছে। (কিশতিয়ে নূহ, বাংলা-৬৫)

এ ধরণের উদ্ভট দাবিগুলো মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু ঈসা মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করা বা নবুওয়াত দাবি করা– এগুলো এ কারণে করেছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, এসবকে প্রমাণ করার জন্য পরবর্তীকালে সে কুরআন ও হাদীসের নানা অপব্যাখ্যা দাঁড় করেছে। দাবিগুলো মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে হলে সে এই অপব্যাখ্যার আশ্রয়ে যেতো না। তার সামগ্রিক তৎপরতা দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে শুরু থেকে একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে। মৌলিক দাবিগুলো তার সে প্ল্যানের অংশ।

**সাবের চৌধুরী :** মির্যা কাদিয়ানীর একাডেমিক যোগ্যতা কেমন ছিল? শরীয়া ও জেনারেল উভয়দিক থেকেই।

**আবু সালমান :** মির্যা গোলাম আহমদ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা অর্জন করেনি। বাড়িতে এসে কয়েকজন উস্তাদ তাকে পড়িয়ে যেতেন। তিনজন উস্তাদের কথা জানা যায়। ফজলে আহমদ, ফজলে এলাহী ও গুল আলী শাহ। তিনজন তিন শ্রেণীর। একজন হানাফী, একজন শিয়া, একজন গাইরে মুকাল্লিদ। নাহব, সরফ মানতেকের কিছু কিতাব পড়েছে। (বিস্তারিত জানতে– রূহানী খাযায়েন-১৩:১৭৯-১৮১) এছাড়া নিজের পিতার কাছে কিছু ডাক্তারি বিদ্যা পড়েছে। তার

বাবা হেকিম ছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মের কিতাবাদি সে প্রচুর পড়েছে। শিয়া, হিন্দু, আর্য সমাজ ইত্যাদি। এ কারণে দেখা যায় তার বিভিন্ন দাবিও সে সকল ধর্মের অনেক দাবির সাথে মিলে যায়।

**সাবের চৌধুরী :** কুরআন হাদীসকে মূল উৎস থেকে বুঝার মত যোগ্যতা তার ছিল না, বিষয়টি কি এমন?

**আবু সালমান :** হ্যাঁ, সে রকম যোগ্যতা তার ছিল না। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের অপব্যবহার ও অপব্যাখ্যা যা করতো, সেগুলোর মূল হোতা ছিল তার একান্ত সহচর হাকীম নূরুদ্দীন। আমাদের কাছে 'মাকতুবাতে আহমদ' নামে মির্যা কাদিয়ানীর চিঠির সংকলনটি আছে। এখানে এক চিঠিতে দেখা যায়, মির্যা কাদিয়ানী হাকীম নূরুদ্দীনকে বলছে, আপনি যে মাসীহ দাবি করার কথা বলছেন, আমার আসলে নিজেকে মাসীহ দাবি করার ইচ্ছে নেই। এর দ্বারা বুঝা যায় কখন কোন দাবি করতে হবে, কী বলতে হবে এগুলোর পেছনে কলকাঠি নেড়েছে হাকীম নূরুদ্দীন। তবে সবটাই যে নূরুদ্দীন করে দিত তা নিশ্চয়ই হবে না। সে নিজে নিজেও কিছু পড়াশোনা করেছে। কিন্তু নিজে কুরআন হাদীস ভালোভাবে অধ্যয়ন করে দক্ষতার সাথে বিকৃত করতে পারবে এমন একাডেমিক শক্তি তার ছিল না। এটা তার রচনাবলীর দিকে তাকালেই বুঝা যায়। কিন্তু তার দাবি ছিল বিরাট। তার খুতুবাতে ইলহামিয়া কিতাবটির ক্ষেত্রে সে দাবি করেছে কুরআনের শব্দ যেমন 'মুজিয', আমার এই কিতাবের শব্দও তেমন মুজিয। আমার পরিচিত এক আরব শায়েখ আছেন, যিনি এর ভাষাগত অনেক ভুল বের করে দেখিয়েছেন।

**সাবের চৌধুরী :** তাদের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচনের সময় নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়ে মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটা অংশ আলাদা হয়ে যায়। পরবতীতে বিচ্ছিন্ন দলটি 'লাহোরী জামাত' নামে পরিচিত হয়। এ দুই দলের আকীদার মধ্যে ব্যবধান কতটুকু?

**আবু সালমান :** লাহোরী জামাত মোট চারটি বিষয়ে অন্য কাদিয়ানীদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা বলে প্রচার করে।

**এক.** মির্যা গোলাম আহমদ নবী নয়; বরং ঈসা মসীহ, মাহদী, মুজাদ্দিদ ইত্যাদি। বিপরীতে মূলধারার কাদিয়ানীরা তাকে নবী হিসেবে মানে।

**দুই.** মির্যা কাদিয়ানীকে মানে না এমন মুসলমান কাফের নয়, পথভ্রষ্ট। মূলধারা সকলকে কাফের মনে করে। এ দুটো হলো মূল।

**তিন.** আরেকটা বিষয় হলো তারা মনে করে– কাদিয়ানী জামাতটি কোন আধ্যাত্মিক খেলাফতব্যবস্থা নয়; সংগঠন। মূলধারা একে খেলাফতব্যবস্থা হিসেবে পালন করে।

**চার.** মির্যা কাদিয়ানী বলে গিয়েছিল, আল্লাহ আমার সন্তানদের থেকে একজন মুসলিহ দান করবেন। একে তারা মুসলিহে মাওঊদ বলে স্মরণ করে। মূলধারাটির দাবি হলো সেই মুসলিহ হলো বড় ছেলে মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ। লাহোরি জামাত তা স্বীকার করে না।

কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, এই ব্যবধান কিন্তু লাহোরী জামাতের লোকজন প্রথমে মানতো না। বরং, মির্যা কাদিয়ানীর সমস্ত কিছু মেনে নিয়েই তার দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়ার পর তারা এগুলো সৃষ্টি করে নিয়েছে। অন্যথায় স্বয়ং মুহাম্মদ আলীর পূর্বের অনেক বক্তব্য আছে, যেখানে সে নবী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

**সাবের চৌধুরী :** এখন তারা যে ব্যবধানগুলো প্রচার করে, বর্তমানে এগুলো কি তারা সত্যিই মান্য করে?

**আবু সালমান :** দেখুন, ওরা এখন এই ব্যবধানগুলো প্রচার করছে ঠিক, কিন্তু যেখানে মির্যা স্বয়ং নিজেকে অসংখ্য বার নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেছে, মুসলমানদেরকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছে, এসব যারা মানবে না, তাদের বিরুদ্ধে বই লিখেছে, তাদেরকে জামাত থেকে বের করে দিয়েছে, সেখানে তারা মির্যাকে মানবে আবার এগুলো স্বীকার করবে না, তা হয় কী করে? তারা তো মির্যার নবুওয়াত দাবি সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে মিথ্যা বলে না। ফলে, লাহোরী জামাতের এই ব্যবধান-প্রচার আসলে ধোপে টিকে না।

**সাবের চৌধুরী :** উলামায়ে কেরাম কি উভয় দলকেই কাফের বলেন? নাকি কোন ব্যবধান করেন?

**আবু সালমান :** উভয় দলই কাফের। উলামায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে কোন ব্যবধান করেননি। প্রসঙ্গত আল্লামা ইকবাল প্রথম দিকে লাহোরী দলের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, দুই দল মূলত একই গাছের দু'টি ডাল। পাকিস্তানে কাফের বলে রায় হওয়ার আগে কাদিয়ানীদের মূলধারার উপর তের দিন এবং লাহোরী জামাতের উপর তিনদিন, মোট ষোল দিন জেরা হয়। এরপর উভয় দলকেই কাফের ঘোষণা করা হয়।

**সাবের চৌধুরী :** বর্তমানে কি লাহোরী জামাতের অস্তিত্ব আছে? আমাদের দেশে বা পাকিস্তানে অথবা অন্য কোথাও?

**আবু সালমান :** আমি কাদিয়ানী বিষয়ে বাংলাদেশের কয়েকটা জেলা ছাড়া বাকি সবগুলো জেলাতেই গিয়েছি। আমার দেখা মতে, বাংলাদেশে এই দলের উপস্থিতি নেই। বাংলাদেশে মূলধারার কাদিয়ানীরা লাহোরী জামাতের বিরুদ্ধে একটা বই লিখেছে 'নবুওয়াত ও খেলাফত' নামে। এর শুরুতে তারা বলেছে, যদিও আমাদের দেশে ওদের কোন লোক নেই, কিন্তু যদি এই মানসিকতার কেউ থাকে, তাহলে তার জন্য এই বই। তবে পাকিস্তানে তাদের কার্যক্রম আছে। তাদের ওয়েবসাইটও আছে। পাকিস্তানে উলামায়ে কেরাম উভয় দলেরই মোকাবেলা করছেন।

**সাবের চৌধুরী :** মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সাথে আমরা আরেকজন ব্যক্তির উপস্থিতি দেখতে পাই, যিনি পরবর্তিতে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন– হাকীম নূরুদ্দীন। তার জীবনী দেখলে বোঝা যায়, বেশ পড়াশোনা জানা লোক ছিলেন। বড় বড় উস্তাদের কাছে হাদীসসহ বিভিন্ন কিতাবাদি পড়েছেন। তার মতো একজন মানুষ এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন, স্বভাবতই এটা বেশ অবাক করা ব্যাপার! এর কারণ কী হতে পারে? অর্থাৎ, তার চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে কি এমন কিছু ছিল, যাকে এর জন্য দায়ী করা যায়?

**আবু সালমান :** জ্বী, অবশ্যই ছিল। যদিও সে অনেক পড়ালেখা করেছে। বড় বড় উস্তাদের কাছে পড়েছে। কিন্তু তার চিন্তা-চেতনায় প্রকৃতিবাদিতা প্রবল ছিল। সে স্যার সৈয়দের বইপত্র দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। তার লিখিত বইপত্র ও তাফসীর দেখলে পরিষ্কার বুঝা যায়, সে অনেকটা মুলহিদ হয়ে গিয়েছিল।

**সাবের চৌধুরী :** মির্যা গোলাম আহমদ প্রচুর বইপত্র লিখেছেন। সে ব্যাপারে যদি একটু বলতেন! পরিমাণ ও গুণগত মান।

**আবু সালমান :** জ্বী, অনেক বই লিখেছে। ছোট-বড় মিলিয়ে সম্ভবত নিরানব্বইটির মত হবে। সবগুলো ২৩ ভলিয়মে 'রূহানী খাযায়েন' নামে সংকলিত হয়ছে। যারা সবগুলো বই পড়েছেন, তারা বলেছেন যে, সবগুলো পড়লে দেখা

যাবে কয়েকটি বই আছে ভিন্ন বিষয়ে; বাকিগুলোতে একই কথা বার বার বলা হয়েছে। সারসংক্ষেপ করলে হয়তো সাকুল্যে দুই খণ্ড হবে।

দেখা যায়, কোন একটা কথা এখানে লম্বা করে বলে গেল, তো কয়েক পৃষ্ঠা পর আবার হুবহু সেই কথাগুলো তুলে দিল। প্রচুর পরিমাণে শুধু ভবিষ্যৎবাণী সংক্রান্ত আলোচনা। আলী মিয়া নদবী রহ. বলেছেন– তার বইয়ে দুটো বিষয় ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। একটা হলো, ভবিষ্যৎবাণী এবং এর সত্যতা ও এসবের গুরুত্ব ইত্যাদি। আরেকটা হলো, ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত না মৃত। এবং আরেকটা বিষয় হলো, নিজের রুহানিয়্যাত। বস্তুত সে তার বইপত্রে শুধু রুহানিয়্যাত, ইলহাম ইত্যাদির কথা বলে বলে নিজের নবুওয়াত দাবি করার মাঠ তৈরী করছিল।

**সাবের চৌধুরী :** আমি আসলে এখনো সরাসরি মির্যা কাদিয়ানীর বইপত্র পড়িনি। কিন্তু নানা বইয়ে তার লম্বা লম্বা উদ্ধৃতিতে দেখলাম, শিশুদের মত অত্যন্ত হাস্যকর কথাবার্তা বলে যাচ্ছে। আমার খুব অবাক লাগে, অনেক শিক্ষিত সমঝদার মানুষও কীভাবে তাকে শ্রদ্ধা করে এবং মানে।

**আবু সালমান :** জ্বী, একটা ঘটনা শোনাই। আমি জামালপুরে একবার তাদের ওখানে গেলাম। একজনকে বললাম, আপনারা যাকে নবী হিসেবে মানছেন, তার চারিত্রিক দিকটিও দেখার দরকার ছিল। তিনি এতো নোংরা নোংরা ভাষায় উলামায়ে কেরামকে গালি দিচ্ছেন, যা মুখে আনাও সম্ভব নয়। তখন লোকটা বলে উঠলো– এগুলো তো অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ কথা! আপনি কোথায় যাবেন এবার?

**সাবের চৌধুরী :** জ্বী, এরপর তো আসলে সমস্ত কথাই বন্ধ হয়ে যায়। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে তাদের আকীদা কী? তাদের কি আলাদা কোন সংকলন আছে?

**আবু সালমান :** দেখুন, কুরআনের শব্দ তো পরিবর্তন করার সাহস পাবে না। ওরা মূল কুরআনকে মানার কথাই বলে। কিছুদিন আগে ওরা পঞ্চগড় সাতক্ষীরাসহ কয়েকটি জেলায় কুরআনের প্রদর্শনী করেছে। দেখিয়েছে, তারা ৬৫টি ভাষায় এর অনুবাদ করেছে। তো বাহ্যত দেখায় ওরা কুরআনুল কারীমের খেদমত করছে। কিন্তু ওরা কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে ভয়ানক বিকৃতি করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ আলকাউসার পত্রিকায় এ ব্যাপারে একটি রচনা ছাপা হয়েছে। আমার সামনে ওদের বাঙলা ও ইংরেজি কয়েকটি তরজমা আছে। সবগুলোতে অসংখ্য জায়গায় ওরা এই বিকৃতিটা করেছে। এর পাশাপাশি মির্যা কাদিয়ানী নিজের কথিত ইলহামকে কুরআনের মতই অকাট্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। (একটি ভুল সংশোধন-৮)

এই ইলহামগুলোর একটা সংকলন তারা করেছে 'তাজকেরা' নামে। আমরা জানি, তাজকেরা কুরআনুল কারীমের একটা নাম। তারা সেই 'ইলহাম'গুলোকে এ নাম দিয়েছে। এবং এর টাইটেলে লিখা আছে 'ওহিয়ে মুকাদ্দাস' বা পবিত্র ওহী। মির্যার ছেলে বশির আহমদ বলেছে, আমাদেরকে এই তাজকেরা নিয়মিত তেলাওয়াত করতে বলা হয়েছে। এটা তেলাওয়াত করে যে আনন্দ লাভ হয়, তা অন্য কোন কিতাব পড়ে লাভ হয় না।

**সাবের চৌধুরী :** তাহলে তো দেখা যাচ্ছে অঘোষিতভাবে তারা নিজেদের জন্য আলাদা একটা কুরআন সংকলন করে ফেলেছে। আচ্ছা, আমরা এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। কোন কোন দেশে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফের বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করে আইন পাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এই দাবি উঠছে বহুদিন যাবত। তো, কাউকে কাফের বলে ঘোষণা দেওয়া তো মুফতীগণের কাজ। এটা রাষ্ট্রের কাছে চাওয়া হচ্ছে কেন?

**আবু সালমান :** দেখুন, এখানে দুটো বিষয়। এক হলো কাদিয়ানীরা কাফের কি কাফের না, তা নির্ণয় করা। তো, এটা উলামায়ে কেরামের কাজ। দ্বিতীয় হলো ওদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করা। এটা এমন, ধরুন এক জায়গায় ভাইরাস দেখা দিয়েছে। সরকার একদল বিশেষজ্ঞ ঠিক করে দিল জিনিসটা যাচাই করার জন্য। তারা গিয়ে নির্ণয় করবে। এরপর সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে নানা বিধিনিষেধ জারি করবে। এখানেও ব্যাপারটা এমনই। রাষ্ট্রের কাছে ফতওয়া চাওয়া হচ্ছে না। শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা চাওয়া হচ্ছে।

**সাবের চৌধুরী :** কিন্তু রাষ্ট্রের এই ঘোষণা দেওয়াটা জরুরী কেন?

**আবু সালমান :** খুবই জরুরী। এটা পরিচয় সংরক্ষণের প্রশ্ন। একদল নকল কারবারী যদি কোন কোম্পানির নামে ভেজাল পণ্য তৈরী করে, তাহলে সরকারের দায়িত্ব হলো সে কোম্পানির পরিচয়কে হেফাজত করা, যেন জনগণ ধোঁকায় না পড়ে। এখানেও বিষয়টি এমন। ওরা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে মুসলমানদেরকে অমুসলিম বানিয়ে ফেলছে, মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করছে, কুরআনের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করছে এবং সাধারণ মানুষ ওদেরকে মুসলিম মনে করেই ওদের কথাগুলো বিশ্বাস করে ফেলছে; এমনিভাবে বামপন্থী ও নানা রাজনৈতিক নেতারা তাদের সমাবেশগুলোতে গিয়ে তাদেরকে শান্তিকামী মুসলিম বলে প্রশংসা করছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা হলে এই ধোঁকা ও প্রতারণাগুলো বন্ধ হবে। এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

**সাবের চৌধুরী :** বর্তমানে কারো কারো মন্তব্য হলো– রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য আন্দোলন করার দরকার কী? এর চেয়ে উলামায়ে কেরাম যদি দেশব্যাপী জনগণের কাছে তাদেরকে দলীল-প্রমাণসহ কাফের হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, এটা বেশি কার্যকর। আপনি কী বলেন?

**আবু সালমান :** আমি মনে করি, গঠনমূলকভাবে দুটোরই দরকার আছে। একটা দিয়ে আরেকটার কাজ হবে না। তবে এটা ঠিক আমাদের দেশে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আমাদের দাওয়াতী মিশন ও সতর্কীকরণমূলক আলোচনা আশানুরূপভাবে হচ্ছে না। এ জায়গাটাতে আরো গঠনমূলকভাবে বেশি পরিমাণে কাজ হওয়া দরকার। তাদেরকে শুধু কাফের বললে হবে না, তারা কেন কাফের সেই দলীল ও বিশ্লেষণও সাধারণ মানুষের সামনে সুন্দরভাবে নিয়ে আসতে হবে।

ধরুন, কোন এলাকায় গিয়ে আপনি কাদিয়ানীরা কাফের ও দালাল বলে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে এলেন। আপনি চলে আসার পর ওরা সাধারণ মুসলমানদের কাছে এসে বলবে, আমরা তো তোমাদের মতই মুসলমান; কুরআনের খেদমত করি, তবু আমাদেরকে কাফের-দালাল বলা হলো! এর প্রমাণ দেখাও। সাধারণ মানুষ কিন্তু তখন কিছু বলতে পারে না। ফলে, সে সময় একটা উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়। এটা আমি কথার কথা বলছি না। বাস্তবে এমনটা ঘটতে দেখেছি।

**(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

সমসাময়িক প্রসঙ্গ

# আফগান শান্তিচুক্তি, দিল্লী গণহত্যা ও করোনা ভাইরাস

মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ সাইম

## আফগান শান্তিচুক্তি : যেন মূসার সামনে ফিরআউনের অসহায় আত্মসমর্পণ

কাতারের রাজধানী দোহা। ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০। এক অবিশ্বাস্য ও ঐতিহাসিক দিন। পুরো পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল– মুহুর্মুহু তাকবীরধ্বনির অনির্বচনীয় পরিবেশে যুগের আবূ লাহাব আর ফিরআউন কতোটা বিপর্যস্ত ও কোণঠাসা হয়ে মুহাম্মাদ আর মূসার নগণ্য একদল খাদেমের হাতে অসহায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হল! প্রায় উনিশ বছর ধরে নাকানিচুবানি খেয়ে পৃথিবীর সুপার পাওয়ার আমেরিকা এদিন প্রায়-নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল তালেবানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করল!!

এ যেন চিরঞ্জীব সত্তার নিম্নোক্ত ঘোষণার শাশ্বত রূপ–

'ফিরআউন ভূমিতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল এবং সে তার অধিবাসীদেরকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একটি শ্রেণীকে সে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে যবাই করতো ও তাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিতো। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ফ্যাসাদ বিস্তারকারীদের একজন।

আর আমি চাচ্ছিলাম সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদরকে নেতা বানাতে এবং তাদেরকেই সে দেশের ভূমি ও সম্পদের উত্তরাধিকারী বানাতে। এবং সে দেশে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে আর ফিরআউন, হামান ও তার সৈন্যদেরকে সেই জিনিস দেখিয়ে দিতে, যা থেকে বাঁচার জন্য তারা কলাকৌশল করছিল।' (সূরা কাসাস-৫-৭)

'আর তারা গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করল এবং আল্লাহও গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলী।' (সূরা আলে ইমরান-৫৪)

'তারা সব রকম চাল চেলেছিল, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সমস্ত চাল ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা ছিল, হোক না তাদের চালসমূহ এমন শক্তিশালী, যাতে পাহাড় টলে যায়। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে কখনও এমন ধারণা মনে আসতে দিবে না যে, তিনি নিজ রাসূলদেরকে দেয়া ওয়াদার বিপরীত করবেন। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় সকলের উপর প্রবল এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা ইবরাহীম-৪৬-৪৭)

সত্যি বলতে কি, চুক্তির আগ মুহূর্তে দোহাস্থ হোটেল শেরাটনে তালেবানদের অবিস্মরণীয় বিনীত প্রবেশ, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মুহুর্মুহু তাকবীরধ্বনি এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালীন সূরা নাসর-এর তিলাওয়াত বিশ্ববাসীকে চৌদ্দশত বছর পূর্বের এক সোনালী অতীত স্মরণ করিয়ে দিল।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. এক টুইটবার্তায় লিখেছেন– ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ মোতাবেক ৪ রজব ১৪৪১ হিজরী। এ দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ দিনে সহায়-সম্বলহীন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান রাশিয়ার পর আরেক সুপার পাওয়ার আমেরিকা ও তার ৪৮টি মিত্রশক্তিকে শুধুমাত্র নিজেদের ঈমানী শক্তি ও প্রাণপণ লড়াইয়ের মাধ্যমে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করেছে এবং প্রতিষ্ঠিত করেছে কুরআনের শাশ্বত বাণী– 'তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাকো।'

চুক্তি অনুযায়ী আগামী ১৪ মাসের মধ্যে আমেরিকা ধাপে ধাপে আফগানিস্তানে থাকা তার ১৩ হাজার পরাজিত হায়েনাকে ফিরিয়ে নেবে। এ সময়টাতে তালেবান আফগানিস্তানে বসানো আমেরিকার পুতুল সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে দেশের অবশিষ্ট অংশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। অবশিষ্ট অংশ বলার কারণ হল, এই চুক্তির আগে থেকেই তালেবান আফগানিস্তানের ৮০/৮৫ ভাগ অঞ্চল দখলমুক্ত করে সেখানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা পুনর্বহাল করেছিল। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, ডাকাতগুলো শখ করে গাছে চড়েনি, বরং গৃহমালিকের প্রবল তাড়া খেয়েই জান বাঁচাতে বৃক্ষমুখী হয়েছে।

তাছাড়া উনিশ বছর ধরে চাপিয়ে দেয়া এই অনৈতিক ও অসম যুদ্ধে নিজেদের প্রত্যেক সৈনিকের পেছনে আমেরিকার বাৎসরিক খরচ হয়েছে প্রায় ১০ লাখ ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ (ডলার প্রতি ৮৩ টাকা ধরে) ৮৩ কোটি টাকা। আর আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির গবেষণা মতে, আফগানিস্তানে ২০০১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার যুদ্ধখরচ ৯৭৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ আশি লাখ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত কোটি টাকা। এই খরচ আফগান যুদ্ধে সহায়তার জন্য বিভিন্ন দেশকে দেয়া সাহায্য খরচের অতিরিক্ত। অনুরূপভাবে মানবতাবিধ্বংসী এ অন্যায় যুদ্ধে আমেরিকা (নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী) সৈন্য হারিয়েছে ২৩০০ জন। আহত হয়েছে ২০,০০০-এর অধিক সৈনিক। মানসিক বিকারগ্রস্ত যে কত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং নিশ্চিত করেই বলা যায়, অর্থ ও জনশক্তির এই বিপুল খরচের উপর্যুপরি ধকল আমেরিকার অর্থনীতি ও জনসাধারণকে পঙ্গু করে ছেড়েছে।

যিনি বলেছেন সত্য বলেছেন, এই যামানায় আল্লাহ তা'আলা যে জালেমশক্তির মাথা গুঁড়ো করে দিতে চান, তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আফগানিস্তানের পথ দেখিয়ে দেন!

বস্তুত আফগানিস্তান আমেরিকার জন্য এমন এক লোকমায় পরিণত হয়েছিল, যা না সে গিলতে পারছিল, আর না পারছিল উগরে দিতে। অবশেষে নিজেদের নিশ্চিত পরাজয়কে কিছুটা মহিমাময় করতেই লোকদেখানো এই চুক্তির আয়োজন!

অপরদিকে দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জিহাদে শহীদ হয়েছে লক্ষ লক্ষ আফগান নাগরিক। আহত ও চিরতরে পঙ্গু হয়েছে লক্ষ লক্ষ শিশু ও নারী-পুরুষ। হিজরত করে দেশত্যাগ করেছে অসংখ্য সাধারণ মানুষ। তা সত্ত্বেও তালেবানরা হিম্মত হারায়নি। নিজেদের সীমিত সাধ্য ও সামর্থ্য নিয়েই তারা হানাদার পরাশক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেছে উনিশটি বছর। এই বর্ণনাতীত ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতেই আজ তাদের অর্জিত হয়েছে মহান বিজয়।

তবে এখনো শেষকথা বলায় সময় আসেনি। ইয়াহুদ-নাসারাদের চুক্তিভঙ্গ ও

বিশ্বাসঘাতকতা তো প্রবাদতুল্য। তালেবানকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তালেবান মুখপাত্রের দ্বীধাহীন উচ্চারণ– আমেরিকার প্রতি পূর্ণ অবিশ্বাস রেখে কেবল শান্তির স্বার্থেই আমরা চুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছি। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমেরিকা যদি ফের কোন ভিত্তিহীন অভিযোগ ও ফালতু অজুহাত তুলে একতরফা চুক্তি ভঙ্গ করে তখন আপনারা কী করবেন? তার উত্তরটি ছিল বড়ই চমকপ্রদ ও ঈমানদীপ্ত– 'আমরা আবারও বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দেবো।'

দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট একটি দেশের দুর্বল ঈমানদার হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা, আমেরিকা নিজেকে চূড়ান্ত লাঞ্ছনার সে পথে অগ্রসর না করুক এবং আফগান জনগণের আস্থাভাজন তালেবানের হাত ধরেই সেখানে ফিরে আসুক শান্তির দিন।

## দিল্লীতে নেমে এসেছে আরাকানের কালোরাত

পাড়ায়-পাড়ায় লেলিহান অগ্নিশিখা। বাতাসে মানুষপোড়া উৎকট দুর্গন্ধ। হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ লাশের সারি। চারপাশে ভস্মীভূত, বিধ্বস্ত বাড়ি-গাড়ি। পথে পথে স্বজনহারাদের আহাজারি। নালায়-ডোবায় ভাসমান গলিত লাশ। মজলুমকে জালেম সাব্যস্ত করার অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য। মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার হওয়ার সীমাহীন ভয়-ভীতি। সবকিছু মিলিয়ে আক্ষরিক অর্থেই দিল্লী এখন মৃত্যুপুরী। এই রক্ত মুসলমানের, এই মৃত্যু মুসলমানের, এই সারি সারি লাশ মুসলমানের এবং এই পরিকল্পিত গণহত্যার নির্মম শিকার শুধুই মুসলমান।

গুজরাতের কসাইখ্যাত উগ্র মুসলিম-বিদ্বেষী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর সিএএ ও এনআরসি নামে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করে। এর ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ভারতে বসবাসকারী ২০/২২ লাখ মানুষ ভিটেমাটি হারানোর সম্মুখীন। হাতেগোণা কিছু হিন্দু ছাড়া এই আইনের সিংহভাগ ক্ষতির শিকার মুসলমান।

এই কালোআইন পাশ হওয়ার আগে-পরে প্রায় চার মাস ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম জনতার সম্মিলিত অহিংস বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলমান। নাগরিকবৃন্দের সেসব শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে ক্ষমতাসীন বিজেপির পেটোয়া বাহিনী চালিয়েছে চরম অত্যাচার। তাদের এই ধ্বংসোন্মাদনার সূচনা ঘটে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপির অঙ্গ ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সন্ত্রাসীদের হামলার মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে একই সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটি, দিল্লী গার্লস কলেজ ও শাহীনবাগে। সন্ত্রাসীরা প্রতিবাদমুখর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে এবং ছাত্রীদেরকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও এসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণ, বিরোধী নেতা-নেত্রী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মী। প্রতিটি ঘটনায় পুলিশ সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়েছে এবং নিজেরাও সংঘর্ষে অংশ নিয়েছে। ভিডিও ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও কোন ঘটনায় কোন সন্ত্রাসীকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি এবং অপরাধীকে শাস্তির সম্মুখীন করেনি।

এত কিছুর পরও বিজেপির রক্তপিপাসা মিটছিল না। এবার সম্পূর্ণ পরিকল্পিত-ভাবে দিল্লীতে জ্বালিয়ে দেয়া হলো হিংসার আগুন। দিল্লীর জাফরাবাদ এলাকায় এনআরসি বিরোধী শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচীতে বিজেপির হামলার মাধ্যমে এর সূত্রপাত। অল্পক্ষণের মধ্যেই এ আগুন ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। একে একে জ্বলতে থাকল মুসলমানদের ঘর-বাড়ি। মেরে-কেটে নালা-ডোবায় ফেলা হল অগণিত লাশ। মুসলমানদের কিনা যাচাই করে করে জ্বালানো হলো শতশত মোটরযান। আহতদের ধরে ধরে চোখেমুখে ঢেলে দেয়া হল দাহ্যপদার্থ-অ্যাসিড। হামলা চালিয়ে বিধ্বস্ত করা হল আল্লাহর ঘর মসজিদ; ভেতরে আগুন ধরিয়ে মিনারায় টানানো হল হনুমানজীর পতাকা। আক্রান্ত মুসলমানদের ১৩ হাজার ২০০ ফোন পেয়েও সাড়া দিল না ভারতের সর্বাধিক চৌকষ দিল্লীপুলিশ। বরং খুনিদের সঙ্গে তারাও ঘরবাড়িতে দিচ্ছিল আগুন। আহতদের সকরুণ আর্তিতেও হাসপাতালগুলো পাঠাল না অ্যাম্বুলেন্স। এমনকি ওষ্ঠাগত প্রাণ মুসলমানদের জায়গা হল না হাসপাতালের দেয়ালের ভেতর। আহতদের বহনকারী ব্যক্তিগত অ্যাম্বুলেন্সও রক্ষা পেল না বর্বরদের হিংস থাবা থেকে। হাসপাতালে পৌঁছার আগেই অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর মারা গেল দুই সহোদর।

২৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার শুরু হয়ে চারদিন ধরে চলতে থাকা এই পরিকল্পিত গণহত্যায় খুন হয়েছে দু'জন হিন্দুসহ ৪২ জনেরও বেশি মুসলমান। আহত হয়েছে ৫০০ জনেরও অধিক। এখনো নালা-ডোবা থেকে উদ্ধার হচ্ছে গলিত লাশ।

প্রথমদিকে মনে করা হচ্ছিল, এটি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। দুদিন যেতে না যেতেই স্পষ্ট হয়ে গেলো, এটা বিজেপি হাইকমান্ডের ইশারায় ঘটানো পরিকল্পিত মুসলিম গণহত্যা, যেমনটি ঘটানো হয়েছিল রোহিঙ্গাদের উপর আরাকানে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার পাশাপাশি ভারতীয় আনন্দবাজার-সহ প্রায় সকল গণমাধ্যম এই হত্যাকাণ্ডকে জেনোসাইড বা পরিকল্পিত গণহত্যা হিসেবে দেখছে। এই গণহত্যার দুদিন আগ থেকেই বিজেপি নেতারা 'গোলি মারো, কুচাল দো' বলে বলে খুনিদেরকে উস্কে দিচ্ছিল। উসকানীদাতা এই নেতাদের বিচারের দাবীতে সিএএ ও এনআরসি বিরোধী সাংসদদের প্রবল চাপের মুখে ২রা মার্চ বিধানসভার অধিবেশন কয়েক দফা চেষ্টা করেও চালু রাখা যায়নি। বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে স্থগিত।

ন্যাক্কারজনক এ গণহত্যার বেদনা আছড়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। পৃথিবী জুড়ে এর নিন্দা ও প্রতিবাদে সরব হয়েছে সাধারণ মানুষ। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে সর্বত্র। এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, কেরালাসহ সর্বত্র রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছে ছাত্র-জনতা। ১লা ও ২রা মার্চ শুধু ইউরোপেই ১৮টি শহরে এই গণহত্যার প্রতিবাদে মিছিল-মিটিং হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানগণও দলমত নির্বিশেষে সাধ্য অনুযায়ী চালিয়ে যাচ্ছে বিক্ষোভ প্রতিবাদ।

আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. এক টুইটবার্তায় লিখেছেন– 'সারা ভারতে বিশেষত দিল্লীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান বর্বরতা মোদী-সরকারের ঘৃণ্য চেহারা দেখিয়ে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো কী পদক্ষেপ নিবে, এটা তাদের জন্য বড় পরীক্ষা। নচেৎ আন্তর্জাতিক নীতিমালার বাধ্যবাধকতা কি শুধুই মুসলমানদের জন্য? আর আমরা মুসলমানরা কি শুধু মৌখিক প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকবো?'

এদিকে ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত গণসংবর্ধনায় রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ঢাকায় আসার কথা। কিন্তু দিল্লী হত্যাকাণ্ডের জেরে রক্তপিপাসু মোদীর আগমনকে মানতে পারছে না দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ। প্রতিবাদে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ মিছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং

বিশিষ্ট আলেম-উলামা মোদীর ঢাকায় আগমন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। বিবিসি, আনন্দবাজারসহ দেশী-বিদেশী মিডিয়াগুলো বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রচার করছে। যদিও ক্ষমতাসীন দল এসব বাদ-প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছে না।

মোদী বাংলাদেশে আসুক আর না আসুক, তাকে মনে রাখতে হবে, ভারত কোন নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একক তালুক নয়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সর্বাপেক্ষা বেশি ত্যাগ-তিতিক্ষা রয়েছে মুসলমানদের। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত স্বাধীনতাসৌধে খচিত নামগুলো পড়ে দেখলেই এর সত্যতা মিলবে। সুতরাং ভারতের মাটি-পানির মালিকানা ও অধিকার হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের কোনো অংশে কম নয়; বরং বেশি।

তাকে আরও মনে রাখতে হবে, মুসলমানগণ সুদীর্ঘ আটশত বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে তারা ইচ্ছে করলে ভারতবর্ষকে হিন্দুমুক্ত করতে পারতো। কিন্তু তারা তা করেনি। বরং অনেক মুসলিম শাসক রাষ্ট্রীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদেরকে নিয়োগ দিয়েছিল। মুসলিম শাসকগণ যদি আটশত বছর ধরে হিন্দুদেরকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করে লালন করতে পারে, তাহলে বিনিময়ে হিন্দুদেরও অন্তত ৮০০ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের লালন করা উচিত ছিল। কিন্তু ইংরেজ চলে যাওয়ার পর মাত্র ৭২ বছরেই হিন্দুরা এতোটা অধৈর্য হয়ে উঠল?!

তাকে আরও মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের গড়া তাজমহল, লালকেল্লা, কুতুবমিনার ইত্যাদি পর্যটনকেন্দ্র থেকে ভারতের বার্ষিক আয় কত? একজন খুব সুন্দর বলেছেন, লালকেল্লা আর তাজমহল না থাকলে পর্যটকদের দেখানোর জন্য ভারত গরু আর গোবর ছাড়া কিছুই পেতো না। হাস্যপ্রদ হলেও এটাই বাস্তব ও পরম সত্য।

তাকে আরও মনে রাখতে হবে, মুসলিম দেশগুলোতে ভারত যেসব পণ্য-দ্রব্য রপ্তানী করে, এই রপ্তানী আয় ভারতের বার্ষিক বাজেটের কতভাগ?

তাকে আরও মনে রাখতে হবে, মুসলিম দেশসমূহে ভারতীয় পণ্য আমদানী করা ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছাধীন হলেও সেগুলো কেনা, না-কেনা সাধারণ জনগণের ইচ্ছাধীন। জনগণ ইচ্ছা করলে একযোগে ভারতীয় পণ্য বর্জনও করতে পারে!

সুতরাং ঐতিহাসিক ও সমকালীন সকল সত্য ও বাস্তবতা মেনে নিয়ে বিজেপি বরং ভারতের হিন্দুদের উচিত মুসলিমবিরোধী সকল হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। নচেৎ দুনিয়ার নিয়মে সময় একদিন অবশ্যই পাল্টে যাবে, গঙ্গায় প্রবাহিত হবে উল্টোস্রোত এবং আবারও লালকেল্লায় উড্ডীন হবে কালিমার পতাকা!

## করোনায় মৃত্যুর মিছিল : আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়ার এই তো সময়!

নভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর নাম শোনেনি, বর্তমানে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এরই মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে তিনহাজারেরও অধিক মানুষ। ফলে বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে সীমাহীন ভয় ও আতঙ্ক। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা জারি করেছে রেড অ্যালার্ট। পুরো একটি শহর এমনকি আস্ত একটি দেশ সিলগালা করেও কমানো যাচ্ছে না এর প্রাদুর্ভাব। উপদ্রুত শহরগুলোতে নেমে এসেছে যেন কেয়ামতের বিভীষিকা! আক্রান্ত-সুস্থ, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই সেখানে আত্মকেন্দ্রিক; সবার অব্যক্ত উক্তি– ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী!!

দেখা গেছে, মেয়ে তার করোনায় আক্রান্ত মায়ের জন্য আনা খাবার বিশগজ দূরে রেখে কাঁদতে কাঁদতে হাত নেড়ে চলে যাচ্ছে, আর পঙ্গু মা পা হিঁচড়ে হিঁচড়ে সে খাবার সংগ্রহ করছে। আক্রান্ত পুলিশের জন্য ড্রোন উড়িয়ে খাবার পৌঁছে দেয়া হচ্ছে, সহকর্মীরা কেউ কাছে ঘেঁষছে না। পশুর দেহ থেকে মানুষের দেহে ট্রান্সমিশন হচ্ছে শুনে দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পোষা প্রাণীগুলোকে দিনেদিনেই মেরে সাফ করে দেয়া হচ্ছে। কাউকে আক্রান্ত সন্দেহ হলেই ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে। সেখানে কেউ যাচ্ছে না, যাওয়ার সুযোগই নেই। সবার একটাই ভয়, একটাই আশঙ্কা– কাছে গেলে পাছে আমি না আক্রান্ত হয়ে যাই! এ যেন রোজ কেয়ামতের নগদ নমুনা!

### করোনা নামটি যেভাবে এলো

সূর্যের পৃষ্ঠদেশকে ইংরেজীতে বলা হয় করোনা। আলোচ্য ভাইরাসটির বর্হিভাগে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে যে আলোকচ্ছটা দেখা যায়, সেই রকম ছটার কিছু আকৃতি দেখা যায় বলে এর নাম রাখা হয়েছে করোনা।

ভাইরাস সবসময়ই একটি রিসেপ্টর বা বাহকের খোঁজ করে, যার মাধ্যমে সেগুলো উদ্ভিদ বা প্রাণীর শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। এরা যখন কোন রিসেপ্টরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন হাইজ্যাকারের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ দেহকোষগুলোকে তারা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। এতে দেহকোষগুলো হয়তো মারা পড়ে কিংবা ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একপর্যায়ে দেহকোষগুলো আর নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে পারে না। ফলে বাহক বা গ্রহিতা অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি কখনও ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। ভাইরাস সংক্রমণের ফলে আক্রান্ত জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংক্রমণ বাড়তেই থাকে এবং সুবিধাজনক বাহক বা গ্রহিতার শরীরে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে ভাইরাস তার স্বকীয়তা ও উপস্থিতি বজায় রাখে। নভেল করোনা ভাইরাসও একই প্রক্রিয়ার কোন প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে তার দেহকোষগুলোকে দুর্বল বা অকেজো করে দেয়।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, এই ভাইরাসটিকে নির্মূল কিংবা দুর্বল করার মতো কোন প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি। এজন্যই এ নিয়ে এতোটা আতঙ্ক ও ভয়।

### করোনা মানেই মৃত্যু নয়

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসে ২ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে নব্বই হাজারেরও বেশি মানুষ। এদের মধ্যে মারা গেছে তিন হাজার ১৭ জন। ইতোমধ্যে ভাইরাসটি চীনের সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ৬০টিরও অধিক দেশে এবং প্রতিদিনই ছড়িয়ে পড়ছে নতুন নতুন এলাকায়। তবে আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন তেতাল্লিশ হাজার এগারো জন। এ রোগে মৃত্যুর অনুপাত শতকরা ৩ ভাগ। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রথমদিকে জ্বর, সর্দি ও কাশির উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। দেখা গেছে, যারা আগে থেকেই ফুসফুস, লিভার, হার্ট বা অন্য কোন অঙ্গের জটিল রোগে আক্রান্ত নন, অর্থাৎ শরীরটি স্বাভাবিক সুস্থ-সবল রয়েছে, তারা করোনা আক্রান্ত হয়েও কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছেন। পক্ষান্তরে যাদের শরীর আগে থেকেই নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত, তারা এর ধকল সহ্য করতে পারছেন না, ঢলে পড়ছেন মৃত্যুর কোলে।

### উন্নত প্রযুক্তি আর বিপুল বিত্ত-বৈভব যেখানে অর্থহীন

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সুবিশাল সেনাবাহিনী আর বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থনীতিও

করোনার মোকাবেলায় চীনকে তেমন সুফল দেয়নি। বিপদটা যে এদিক দিয়ে আসবে এবং এভাবে তাদেরকে শুইয়ে দিবে তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। দশকের পর দশক ধরে উইঘুর মুসলিমদেরকে তারা যেভাবে বন্দীশিবিরে আটকে রেখে মানবেতর জীবন যাপন করাচ্ছে, একদিন তাদেরকেও সেভাবে বরং তার চেয়েও নির্দয়ভাবে বন্দীশিবিরের বাসিন্দা হতে হবে, তিনমাস আগেও কি তারা এর কল্পনা করেছিল? সারা বিশ্বে এখন চীন ও চীনের নাগরিক আক্ষরিক অর্থেই অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছে। বস্তুত তাদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। করোনা অ্যাটাকের কয়েক মাস আগে তারা নতুন করে কুরআন লেখার ঘোষণা দিয়েছিল! আর উইঘুরদের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছিল নির্যাতনের মাত্রা। খালি চোখে দেখা যায় না, এমন এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাখলুকের কাছে তাদের সমস্ত অর্থবিত্ত ও শক্তিমত্তা আজ অর্থহীন। দুনিয়ার তাবৎ ক্ষমতাদর্পীর কুরআনের এই মর্মবাণী মনে রাখা চাই—

'তারা মনে করেছিল, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন, যার তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। (সূরা হাশর-২)

আজ চীনের স্থবির শহর-নগর এবং দেশে দেশে তাদের জনশূন্য শপিংমলগুলো দেখে ভয় হয়, আল্লাহ যদি এবারের মতো তাদেরকে ছাড় না দেন, তবে শ্রীঘ্রই তারা কুরআনের এই আয়াতগুলোর প্রয়োগস্থল বনে যাবে—

'তারা পেছনে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও প্রস্রবণ। কত শস্য ও সুরম্য বসতবাড়ি। এবং কত বিলাস সামগ্রী, যার ভেতর তারা আনন্দ-ফূর্তি করতো। ওই রকমই হলো তাদের পরিণতি। আর আমি এসব জিনিসের ওয়ারিস বানিয়ে দিলাম অপর এক সম্প্রদায়কে। অতঃপর তাদের জন্য না আসমান কাঁদল, আর না যমীন এবং তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশ দেয়া হল না। (সূরা দুখান-২৫-২৯)

**তাকদীরে বিশ্বাস রেখে সতর্কতা অবলম্বন দোষণীয় নয়**

করোনার আশংকায় সারা বিশ্ব নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী নানারকম সতর্কতা অবলম্বন করছে। উপদ্রুত এলাকার বাসিন্দাদেরকে মাস্ক পরিধানে বাধ্য করা, বাইরের কাউকে উপদ্রুত এলাকায় প্রবেশ করতে না দেয়া এবং উপদ্রুত এলাকা থেকে আগত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা সেগুলোর অন্যতম। এছাড়া বিনা প্রয়োজনে জনসমাগমস্থলে উপস্থিত না হওয়া, বাইরে থেকে ঘরে ফিরে সাবান ইত্যাদি দিয়ে সময় নিয়ে হাত ধোয়া, যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া আক্রান্তের কাছাকাছি না যাওয়ারও পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

একজন ঈমানদারের বিশ্বাস যদি এই হয় যে, রোগ দেয়ার মালিক আল্লাহ তা'আলা, নিরাময়ের মালিকও তিনিই। তিনি ইচ্ছা করলে তবেই কোন ভাইরাস আমার ক্ষতি করতে পারবে, অন্যথায় আমার কিছুই হবে না। কিন্তু তিনি আমাকে আক্রান্ত করার ইচ্ছে করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই, আবার তিনিই আমাকে বাহ্যিক ক্ষতিকর বস্তু যথা আগুন-সাপ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকতে বলেছেন, তাই আমি সতর্কতা হিসেবে এসব পন্থা অবলম্বন করছি, আর ঘটবে সেটাই আল্লাহ যেটার ইচ্ছে করবেন— তাহলে এতে কোন দোষ নেই। বরং মহামারী উপদ্রুত এলাকা প্রসঙ্গে এটাই সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা।

**দু'আর পাশাপাশি করতে হবে আত্মসংশোধনও**

বাংলাদেশ থেকে চীন খুব বেশি দূরে নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও করোনা পজেটিভ রোগী পাওয়া গেছে। তাছাড়া ঈমানের গুণটি ব্যতীত আমাদের জাতীয় চরিত্র চীনাদের চেয়ে খুব একটা ভালো নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহর ব্যাপক আযাব ধেয়ে আসার আগেই নিজেকে শুধরে নিই। আল্লাহ না করুন, বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় করোনার প্রাদুর্ভাব ঘটলে কী যে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হবে, কল্পনাও করা যায় না! এজন্য আগেভাগেই খালেস দিলে তাওবা করি, কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি ইস্তিগফার করি, নেককাজে অগ্রসর হই। পাশাপাশি দু'আরও খুব ইহতেমাম করি।

সাধারণ সময়ে, অনুরূপভাবে বালা-মুসীবত চলাকালীন দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর তা'আলার আশ্রয় কামনা করা নবীজীর বিশেষ সুন্নাত। হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে বিশেষ দু'আও বর্ণিত হয়েছে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

(অর্থ:) হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি আশ্রয় চাই শ্বেত রোগ থেকে, কুষ্ঠ রোগ থেকে এবং (নাম না জানা) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে।

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম দীনী মুরুব্বী শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. এক টুইটবার্তায় লিখেছেন—

'মহামারীর প্রাদুর্ভাব নতুন কিছু নয়, এটা মাঝেমধ্যেই ঘটে থাকে। মহামারী দেখা দিলে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও ভীতি ছড়ানোর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা, ইস্তিগফার ও দু'আ করার পাশাপাশি উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষত এই দু'আ বেশি বেশি পড়তে হবে—

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

**শেষকথা:** আত্মসংশোধন, তাওবা, ইস্তিগফার, দু'আ এবং বাহ্যিক সতর্কতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে এই মহামারীর সম্মুখীন করেন এবং একে কেন্দ্র করে আমাদের মৃত্যু লিখে রাখেন, তবে বিচলিত ও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কেননা, আমাদের জীবন-মরণ সবই তাঁর মালিকানায়। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা তাতে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং তাঁর কোন সিদ্ধান্ত হেকমত থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর উপর কোনরূপ অভিযোগ না তুলে তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকবো এবং হাদীসে বর্ণিত 'প্লেগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ' মর্মে বিশ্বাসী হয়ে শাহাদাতের প্রত্যাশা রাখবো। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার ফেতনা-ফাসাদ ও বালা-মুসীবত থেকে বিশ্ববাসীকে বিশেষত মুসলিম উম্মাহকে ভরপুর হেফাযত করুন। আমীন।

## দু'আর আবেদন

*## জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহতারাম উস্তায, রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার সভাপতি, মুফতী শফীকুর রহমান সাহেবের সম্মানিত পিতা গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঈসাব্দে ইন্তেকাল করেছেন। পাঠকদের নিকট মরহুমের মাগফিরাতে কামেলার জন্য দু'আর আবেদন জানানো যাচ্ছে।*

*## জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার দুই যুগেরও অধিককালের বাবুর্চি জনাব গোলাম আহমদ (ডাক্তার) সাহেব গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসাব্দে পবিত্র উমরাহর সফরে মক্কা মুকাররামায় ইন্তেকাল করেছেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়েছে। মরহুমের মাগফিরাত কামনায় পাঠকের নিকট দু'আর আবেদন জানানো যাচ্ছে।*

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

**আবূ মুহাম্মাদ**
**পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা**

**৩৭৫ প্রশ্ন :** (ক) এলাকার একটি বৃহদায়তন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত জামে মসজিদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান–

(১) বহুদিন ধরে মসজিদে প্রচলিত মীলাদের অনুষ্ঠান হয়। লোকজন মৃত্যুবার্ষিকী, সুস্থতা-কামনা, পরীক্ষার সফলতা, ব্যবসায়িক উন্নতিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মীলাদ পড়ানোর ব্যবস্থা করে। এছাড়া মসজিদ কমিটি শবে বরাত, ঈদে-মীলাদুন্নাবীসহ বিভিন্ন দিবসে মীলাদ ও তাবারুকের আয়োজন করে। উক্ত মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রথমে নামাযের পরে মীলাদ ও দু'আ হবে মর্মে এলান দেয়া হয়। সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দুরূদ পড়া হয়। মীলাদ অনুষ্ঠানটি একজন পরিচালনক কর্তৃক লীড দিয়ে পালন করা হয়, কিছু কবিতা ইত্যাদি পড়া হয়, তারপর মুনাজাত শেষে মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে একজন ইমাম সাহেব এই মীলাদ বন্ধ করার চেষ্টা করায় অপসারিত হন এবং পরবর্তীতে মীলাদ বন্ধের চেষ্টা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

(২) জনগণের ওয়াক্‌ফকৃত অর্থ দিয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে বিশাল আকৃতির ৭/৮টি ঝাড়বাতি লাগানো হয়েছে। এতে বিভিন্ন রঙের আলো ঝলমল করে, যা নামাযে মনোযোগ নষ্ট করে। মসজিদ সুন্দর করার অজুহাতে এগুলো লাগানো হয়েছে।

(৩) রমাযানে তারাবীহ চলাকালীন এলান দেয়া হয় যে, যারা সম্মানী হাদিয়া দিতে চান, দিয়ে যাবেন। প্রায় পুরো রমযান এলান দিয়ে ২৭ রমাযানে যখন খতমে তারাবীহ শেষ হয় তখন জনগণের দেয়া উক্ত সম্মানী বা হাদিয়া তারাবীহ-এর হাফেয সাহেবগণকে এবং মসজিদের স্টাফগণকে বণ্টন করে দেয়া হয়।

এমতাবস্থায় জানার বিষয় হলো–

(১) উক্ত কর্মকাণ্ডগুলোর শরয়ী হুকুম কী?

(২) এ সকল বিষয় মসজিদ হতে দূর করার জন্য মসজিদের ইমাম সাহেব, কমিটি এবং সাধারণ মুসল্লীদের কী কর্তব্য রয়েছে? উক্ত দায়িত্ব পালন করার ফযীলত কী এবং দায়িত্ব পালন না করলে ক্ষতি কী?

(৩) মসজিদের ইমাম, মুয়ায্যিন, স্টাফ এবং কমিটি নির্বাচন ও নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কী দায়িত্ব রয়েছে?

উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদটি সরকারি ওয়াক্‌ফ এস্টেট প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন।

**(খ)** হজ্জ বা উমরাহর সফরে মক্কা-মদীনায় আসরের নামায যে সময় অনুষ্ঠিত হয় সাধারণত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তখন আসরের ওয়াক্তই হয় না। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের হাজীগণ কী করবে? স্থানীয় জামাআতে শরীক হবে, নাকি নিজেরা জামাআত করে পড়ে নিবে?

**উত্তর : (ক)** ১/ক. মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত, অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা কামনা, পরীক্ষার সফলতা, ব্যবসায়িক উন্নতি এ জাতীয় জায়েয উদ্দেশ্যে কোন বুযর্গ বা দীনদার ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়া জায়েয আছে। এতে কোন সমস্যা নেই।

অনুরূপভাবে কোন দিবস উপলক্ষবিহীন শরীয়তসমর্থিত মীলাদ-মাহফিল তথা যে মীলাদ মাহফিলে নবীজীর জীবন-চরিত নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং শরীয়ত পরিপন্থী কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করা হয় না, তার আয়োজন করা জায়েয আছে।

কিন্তু প্রশ্নোল্লিখিত প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল অর্থাৎ যে মীলাদ-মাহফিলের প্রথমে মীলাদ ও দু'আ হবে মর্মে এলান দেয়া হয়, সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দুরূদ পড়া হয়, পরিচালক কর্তৃক লীড দেয়া হয় এবং কিছু কবিতা ইত্যাদি পাঠ করা হয়– এ ধরণের মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে কোন বিষয়ের জন্য দু'আ চাওয়া হলে তা নাজায়েয ও বিদ'আত হবে।

ঠিক তেমনিভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী দিবসসহ অন্য কোন দিবস উপলক্ষে প্রচলিত মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করলে তা নাজায়েয ও বিদ'আত হবে।

তবে শবে বরাত শরীয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতের অনেক ফযীলত রয়েছে। এজন্য এ রাতে ব্যক্তিগতভাবে কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায ও তওবা-ইস্তিগফার ইত্যাদি আমলে লেগে থাকা উত্তম।

কিন্তু উক্ত রাতে মসজিদে কিংবা বাড়িতে প্রচলিত মীলাদের আয়োজন করা, তাবাররুকের ব্যবস্থা করা এবং আলোকসজ্জা ইত্যাদি করা নাজায়েয ও বিদ'আত। শরীয়তে এ জাতীয় কাজ পরিপূর্ণরূপে পরিতাজ্য।

১/খ. যদি উক্ত ঝাড়বাতি জনগণের ওয়াক্‌ফকৃত অর্থ দিয়ে সংগ্রহ করা হয় এবং তা নামাযীর মনোযোগ নষ্ট করে, তাহলে তা জ্বালানো নাজায়েয। এমনকি ব্যক্তিগত অর্থেও তা সরবরাহ করা জায়েয হবে না; মাকরূহ হবে। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

১/গ. কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিনিময় নেয়া এবং দেয়া উভয়টি নাজায়েয। খতম তারাবীহর জন্য বিনিময় আদান-প্রদানের হুকুমও অনুরূপ। আর মসজিদে এলান করে চাঁদা উঠিয়ে হাফেযদের সম্মানী দেয়ার প্রথাও শরীয়তে বর্জনীয়।

সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে হাফেযদের সম্মানী দেয়া ও নেয়া উভয়টি নাজায়েয।

তবে হ্যাঁ! কেউ যদি হাফেয সাহেবকে তাঁর দীনদারীর কারণে মহব্বত করেন, তাহলে মহব্বতের নির্দশনস্বরূপ ব্যক্তিগতভাবে খতমের আগে বা পরে বা যে কোন সময় হাফেয সাহেবকে কিছু হাদিয়া পেশ করবেন।

তবে এটা খতমের দিন বা তারাবীহর শেষে না হওয়া চাই। যাতে বোঝা যায় যে, এটা বাস্তবেই ব্যক্তিগত মহব্বতের নির্দশন স্বরূপ হাদিয়া।

২. উক্ত বিষয়সমূহ মসজিদ থেকে দূর করার জন্য যার যেমন সামর্থ্য আছে, তার তেমন চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং যার সরাসরি বাধা দেয়ার সামর্থ্য আছে, সে সরাসরি বাধা দিবে। যার মুখে নিষেধ করার সামর্থ্য আছে, সে মুখে নিষেধ করবে। যার এর কোনটারই সামর্থ্য নেই সে মনে মনে তার প্রতি ঘৃণা রাখবে।

তবে সরাসরি বাধা দিতে গেলে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সরাসরি বাধা দিবে না; বরং কৌশল অবলম্বন করে দূর করার

চেষ্টা করবে। ফিতনায় জড়াবে না এবং দু'আ ও ইস্তেগফার করতে থাকবে।
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ একটি সুন্নাত যিন্দা করে, তাহলে তার জন্য ঐ সুন্নাতের উপর আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। কিন্তু আমলকারীর সওয়াব থেকে সামান্যতমও কমবে না এবং যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতের সূচনা করবে, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন, তার আমলনামায় সে পরিমাণ গুনাহ হবে, যে পরিমাণ গুনাহ তা পালনকারীর হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২১০)
অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সহায়তা করল। (আল-মু'জামুল আওসাত; হা.নং ৪৭৭২)
৩. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৯৩)
সুতরাং ওয়াকফ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হলো, ইমাম-মুআয্যিন নিয়োগ-দানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হয়ে তাদের নির্বাচনকেই অগ্রাধিকার দেয়া। আর মসজিদ কমিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। (সূরা বাকারা- ৪১, ফাতাওয়া শামী ৬/৫৬, ৬/৩৯৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১৯, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২১০, আল-মু'জামুল আউসাত; হা.নং ৬৭৭২, সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৯৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/১৬৯, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৬৪, ফাতাওয়া উসমানী ১/১২১, ৩২৮)
(খ) আসরের ওয়াক্তের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের দু'টি মতামত আছে। (১) প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত উক্ত বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া। (২) প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত উক্ত বস্তুর ছায়া তার দিগুণ পরিমাণ হওয়া। প্রথমটি সাহেবাইন রহ.-এর অভিমত। দ্বিতীয়টি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভিমত। প্রামাণ্যতার দিক থেকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতটি অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে যেহেতু আরেকটি মত রয়েছে, সে হিসেবে হজ্জ বা উমরার সফরে মক্কা-মদীনায় আমাদের দেশের হাজীগণের জন্য তাদের সাথে আসরের নামায পড়ে নেয়া জায়েয হবে, ভিন্ন জামাআত করার প্রয়োজন নেই। (ফাতাওয়া শামী ১/৩৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া ২/১৪৫)

**মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**

**৩৭৬ প্রশ্ন :** আমি একটি মোবাইলের অ্যাপ বানিয়েছি। অ্যাপটিতে বিভিন্ন ইসলামিক কিতাব ও বয়ানসহ কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা আছে। অ্যাপটিতে আমি বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা রেখেছি। কেউ যদি আমার অ্যাপ ব্যবহার করে তাহলে ব্যবহার করা অবস্থায় বিভিন্ন বিজ্ঞাপন তার মোবাইলে ভেসে উঠবে। এই বিজ্ঞাপন আবার কয়েক রকমের হয়ে থাকে। (১) মিউজিকসহ ভিডিও (যেখানে ছেলে-মেয়ে উভয়ই আছে)। (২) মিউজিক ছাড়া ভিডিও (যেখানে ছেলে-মেয়ে উভয়ই আছে)। (৩) মিউজিকসহ ভিডিও (যেখানে পণ্যের বা প্রাণীর ছবি আছে)। (৪) মিউজিক ছাড়া ভিডিও (যেখানে পণ্যের বা প্রাণীর ছবি আছে)। (৫) শুধু ছবি (যেখানে ছেলে-মেয়ে উভয়ই আছে)। (৬) শুধু ছবি (যেখানে পণ্যের ছবি আছে)।
এই অ্যাপে কখন কোন্ বিজ্ঞাপনটি প্রদর্শিত হবে, এ ক্ষেত্রে আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই; যে কোন সময় যে কোন বিজ্ঞাপন চলে আসতে পারে, চাই ব্যবহারকারী অ্যাপের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকুক বা কোন কিতাব পড়তে থাকুক অথবা এমনও হতে পারে যে, অ্যাপ থেকে বের হয়ে আসার আগ মুহূর্তে বিজ্ঞাপন চলে এসেছে। অনুরূপভাবে ব্যবহারকালীন একাধিকবারও বিজ্ঞাপন আসতে পারে।
জানার বিষয় হলো–
(ক) এভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে উপার্জিত টাকা আমার জন্য হালাল হবে কি না?
(খ) যদি বিজ্ঞাপন আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে, (যেমন- আমি যদি বলে দিই, এমন বিজ্ঞাপন দেয়া হোক, যেখানে প্রাণীর ছবি নেই এবং বাদ্যযন্ত্রের শব্দও নেই) সেক্ষেত্রে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় এই বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে দেখানোর কারণে আমি কি গুনাহগার হবো?
**উত্তর :** (ক) প্রশ্নের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনার অ্যাপের মধ্যে যে বিজ্ঞাপন দেখানো হয়, সেখানে শুধুমাত্র পণ্যের ছবি দেখানো হয় না; বরং সাথে সাথে বাদ্যসহ বেগানা নারী-পুরুষের ছবিও দেখানো হয় এবং কখন কি ধরণের বিজ্ঞাপন দেখানো হবে সেটাও আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আবার আপনি ইচ্ছা করলে বিজ্ঞাপনের সিস্টেমটি বন্ধও রাখতে পারেন।
এদিকে বেগানা নারী-পুরুষকে সরাসরি দেখা যেমন হারাম তদ্রূপ তাদের ছবি বা ভিডিও চিত্র দেখাও হারাম।
যেহেতু আপনার অ্যাপে বেগানা নারী-পুরুষের বিজ্ঞাপনও দেখানো হয়, যেটা গুনাহের কাজ। অপরদিকে গুনাহের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জন হারাম। তাই উক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জন আপনার জন্য হালাল হবে না।
যেহেতু বিজ্ঞাপন আসার সিস্টেমটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আপনি ইচ্ছা করলে সেটা বন্ধও রাখতে পারেন, তাই আপনার জন্য উক্ত বিজ্ঞাপনের সিস্টেম বন্ধ রাখতে হবে। (সূরা মায়িদা- ২, সূরা নূর- ৩০, ৩১, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী ৬/৪২০, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫০, মাজমাউল আনহুর ৩/৫৩৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৫৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৯১, ২০৩)
(খ) প্রথমত অ্যাপের মাধ্যমে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ঠিক নয়। কারণ, এতে কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তবে যদি একান্ত প্রয়োজনে তিলাওয়াত করতে হয়, তাহলে কুরআন শরীফের আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রেখে তিলাওয়াত করতে হবে। এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে কুরআন শরীফের সাথে বেয়াদবী প্রকাশ পায়। বেয়াদবী হলে গুনাহ হবে।
প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে যেহেতু তিলাওয়াতরত অবস্থায় পণ্যের ছবি চলে আসে এবং সেটা ইচ্ছা করলে আপনি বন্ধও রাখতে পারেন সুতরাং তিলাওয়াতরত অবস্থায় কোন ছবি আসা কুরআন শরীফের মাঝখানে কোন ছবি ছেপে দেয়ার মত; এটা কুরআন শরীফের আদব পরিপন্থী এবং এটা তিলাওয়াত থেকে মনোযোগ সরিয়ে দুনিয়াবী কাজে মনোযোগ বসিয়ে দেয়; যা মাকরূহ। আর এই মাকরূহ কাজের মাধ্যম হলেন আপনি। তাই আপনি গুনাহগার হবেন। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী ৯/১৫৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৮৫৩৭, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২২৮, ফাতাওয়া শামী ১/৫৪৬, আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া ১২/২৩৭, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ৪/৩৮)

**মাওলানা সাঈদুয্যামান**
**মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**৩৭৭ প্রশ্ন :** আমাদের দেশে ই-ভ্যালী নামে একটি অনলাইন শপ (ইন্টারনেট ভিত্তিক দোকান) রয়েছে। এর লেনদেন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ–
ই-ভ্যালী নিয়মিত বিভিন্ন পণ্যে বাজার মূল্যের চেয়ে ৩০% থেকে ৬০%

মূল্যহ্রাস দিয়ে থাকে। কিন্তু এ মূল্যহ্রাস একটু ব্যতিক্রমধর্মী।
১. ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ের সময় বাজারমূল্যই পরিশোধ করতে হয়।
২. অতঃপর ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ই-ভ্যালীর সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে তার পণ্য বুঝিয়ে দেয়।
৩. ঠিক তখনই ক্রেতার অ্যাকাউন্টে মূল্যহ্রাসকৃত অংকটি যোগ হয়। কিন্তু এ অংকটি ব্যবহারযোগ্য হওয়ার জন্য সর্বমোট ২১ দিন সময় লাগে।
৪. উপরন্তু মূল্যহ্রাসের ধরনটা হলো ক্যাশ ভাউচার অর্থাৎ ক্রেতা হ্রাসকৃত অংক দিয়ে ই-ভ্যালী থেকেই কিছু কিনতে পারবে; ক্যাশ টাকা পাবে না।
প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত লেনদেন কতটা শরীয়তসম্মত?
**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত অনলাইন শপ ই-ভ্যালী'র যে সিস্টেম উল্লেখ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী এই শপের সঙ্গে লেনদেন করা নাজায়েয। কারণ এতে এমন কিছু সিস্টেম রয়েছে যেগুলোকে শরীয়ত অনুমোদন করে না। যথা:
১. যেহেতু নির্দিষ্টভাবে মূল্যহ্রাসের কথাটা পূর্ব থেকেই উল্লেখ থাকে। সুতরাং হ্রাসকৃত অংশ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে না। বরং হ্রাসকৃত অংশ বাদে বাকী মূল্যই হলো এমন লেনদেন চুক্তির প্রকৃত মূল্য। সুতরাং মূল্যহ্রাসের নামে তারা যে অংকটা নেয়, সেটা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। এ হিসেবে এ ধরনের বিক্রয় চুক্তি করযের (ঋণের) শর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা শরীয়তমতে একটি ফাসিদ শর্ত।
২. আর উক্ত ঋণের টাকা দিয়ে পুনরায় তাদের কোম্পানী থেকে পণ্য কিনতে হবে, যা মূল চুক্তির সঙ্গে আরেকটি ফাসিদ শর্ত।
মোটকথা, ই-ভ্যালীর লেনদেনের আসল রূপ হচ্ছে, মূল লেনদেনের সঙ্গে ঋণপ্রদান এবং উক্ত ঋণ দিয়ে দ্বিতীয়বার তাদের থেকে পণ্য ক্রয় করার শর্তসহ চুক্তিটা সম্পাদন করা। কিন্তু শরয়ী বিধানমতে উভয় শর্তই ফাসিদ। আর ফসিদ শর্তের কারণে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সিস্টেম অনুযায়ী লেনদেন করা জায়েয হবে না। (সূরা বাকারা- ১৮৮, ২৭৫, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১২৩১, মুখতাসারুল আহকাম ৫/২৯৮/১১৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ১০৫৩, আল-মু'জামুল আউসাত; হা.নং ৪৩৬১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২০৬৯০, ফাতাওয়া শামী ৫/৮৪, ১৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৩৪১, আল-হিদায়া শরহুল বিদায়া ৩/৫৯, তাবয়ীনুল হাকাইক ৪/৫৭, আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া ১০/১৬৭, মাজমাউল আনহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর ৩/৯২)

**মাহফুজুর রহমান**
**পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা**

**৩৭৮ প্রশ্ন :** (ক) এক ব্যক্তি চেম্বারে রোগী দেখে। যে সকল রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন তাদের উপার্জনের উৎস সম্বন্ধে তিনি কোন জিজ্ঞাসা করেন না। তবে মাঝে মাঝে কিছু পরিচিত রোগী আসেন, যাদের ব্যাপারে তার পূর্ব থেকেই জানা আছে যে, এদের উপার্জন হালাল-হারাম মিশ্রিত। তিনি তাদের কাছ থেকে ভিজিটের টাকা এই ধারণার ভিত্তিতে গ্রহণ করেন যে, হয়তো তারা তাদের হালাল কোন উৎস থেকে এই টাকাটা দিচ্ছে।
উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তি সাহেবে নিসাব নন। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির ঐ সকল রোগীদের কাছ থেকে ভিজিটের টাকা নেয়াটা বৈধ হয়েছে কি?
(খ) এক ব্যক্তির পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত ৩টি ফ্ল্যাট রয়েছে। যার একটিতে সে বসাবস করে এবং অপর দুটি থেকে মাসে ১৯০০০/- (উনিশ হাজার) টাকার মতো ভাড়া পায়। উক্ত ব্যক্তি অন্য একটি বৈধ খাত থেকে মাসে আরো কয়েক হাজার টাকা উপার্জন করে। এছাড়া উক্ত ব্যক্তির গ্রামে প্রায় ৮ কাঠার মতো জমি রয়েছে, তবে সেখান থেকে কোন আয় হয় না। তার মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৬০০০০/- (এক লক্ষ ষাট হাজার) টাকা, যা সে প্রতি মাসে কিস্তিতে ৫৫০০/- (পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা করে শোধ করছে। সংসারের খরচ ও ঋণ পরিশোধের পর প্রতি মাসে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার মতো উদ্বৃত্ত থাকে। এছাড়া আর কোন সম্পদ তার নেই। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি কি সাহেবে নিসাব গণ্য হবেন?
কেউ যদি এই ব্যক্তিকে যাকাত বা সদকার টাকা প্রদান করে, তাহলে সে কি তা গ্রহণ করতে পারবে? এবং তার উপর কি কুরবানী করা ওয়াজিব?
**উত্তর :** (ক) হারাম সম্পদ কাউকে হাদিয়া দেয়া, তা দ্বারা খানা খাওয়ানো কিংবা এর দ্বারা পারিশ্রমিক দেয়া ও গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তবে যদি কোন ব্যক্তির মালে মাখলুত অর্থাৎ হালাল-হারাম মিশ্রিত সম্পদ থাকে এবং অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয় তাহলে তার দেয়া হাদিয়া ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। এমনিভাবে তার পক্ষ থেকে খানার দাওয়াত গ্রহণ করাও বৈধ। আর যদি তার অধিকাংশ সম্পদ হারাম হয় তাহলে তার দেয়া হাদিয়া ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং তার পক্ষ থেকে খানার দাওয়াত গ্রহণ করাও বৈধ নয়। তবে যদি সে হালাল কোন সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে হাদিয়া ও পারিশ্রমিক দেয় এবং তা থেকে খানা খাওয়ায় তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয।
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে ডাক্তারের পরিচিত রোগীদের হালাল-হারাম মিশ্রিত উপার্জনের অধিকাংশ উপার্জন যদি হালাল বলে জানা যায় বা তাদের আয়ের উৎস অজানা থাকে, তাহলে তাদের থেকে ভিজিট গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে। আর যদি অধিকাংশ উপার্জন হারাম বলে জানা যায়, তাহলে তাদের থেকে ভিজিট গ্রহণ করা বৈধ হয়নি।
বৈধ না হওয়ার সুরতে ডাক্তারের জন্য করণীয় হলো, তিনি তার গ্রহণকৃত ভিজিট অনুমান করে গরীবদের মাঝে সদকা করে দিবেন। ভবিষ্যতে যে সকল রোগীদের ব্যাপারে জানা আছে যে, তাদের অধিকাংশ আয় হারাম তাদের সামনে হারাম মালের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে তাদেরকে এ বিষয়ে তাগিদ দিবেন যে, তারা যেন কোন বৈধ পন্থায় উপার্জন করে হালাল টাকা দিয়ে তার ভিজিট পরিশোধ করে। আর যাদের অধিকাংশ আয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন, তাদেরকে খুটে খুটে জিজ্ঞাসা করা ডাক্তার সাহেবের জন্য আবশ্যক নয়।
বি.দ্র. নেসাবের মালিক হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে এর মাঝে কোন পার্থক্য হবে না। (বাযলুল মাজহুদ ফী হাল্লি সুনানি আবী দাউদ ১/৩৫৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪২, আল-মুহীতুল বুরহানী ফিল-ফিকহিন নু'মানী ৫/৩৬৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৩৪৬, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৭/৬৫)
(খ) ঋণমুক্ত অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির কাছে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য থাকে কিংবা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে তিনি সাহিবে নিসাব গণ্য হবেন। এর চেয়ে কম সম্পদের মালিক হলে তিনি সাহিবে নিসাব নন। বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলার মূল্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির বর্তমানে সংসার খরচ ও প্রতি মাসে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের পরে যেহেতু প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকে এবং গ্রামের বাড়িতে প্রায় আট কাঠা জমি অলস পড়ে আছে যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সুতরাং জমির মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ (প্রায় ৪০,০০০ টাকা) হয় কিংবা জমির মূল্য ও উদ্বৃত্ত টাকা মিলে নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার জন্য যাকাত ও সদকা গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে এবং উক্ত জমির মূল্য যদি হজ্জের নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার উপর হজ্জও ফরজ হবে। এমনিভাবে যখনই তার প্রতি মাসের উদ্বৃত্ত জমা হয়ে টাকার পরিমাণ চল্লিশ হাজার হবে কিংবা উদ্বৃত্ত টাকার সাথে অন্য কোন যাকাতযোগ্য সম্পদ মিলে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা হবে অথবা অন্য কোনভাবে এ পরিমাণ টাকার তিনি মালিক হবেন এবং উক্ত নিসাবের উপর বছর অতিবাহিত হবে তখনই তার উপর যাকাত দেয়া ফরয হবে। (আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী ১/৯৫, মাজমাউন আনহুর ১/২৮৬, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৩, বাদায়িউস সানায়ে ৫/৬৪, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৬৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৮, ৫/২৯২, ২৯৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫৪২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২০১, ২০৪, ২৬/২২৮, ফাতাওয়া উসমানী ২/৫১)

**মাওলানা জামালুদ্দীন**
**চরওয়াশপুর মাদরাসা, ঢাকা**

**৩৭৯ প্রশ্ন :** বর্তমানে এতায়াতীদের সাথে উঠা-বসা, লেন-দেন এবং তাদেরকে সালাম দেয়া বা তারা সালাম দিলে জবাব দেয়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে? এবং তাদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর :** এতায়াতীদের একটি শ্রেণী এমন ভাষায় উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের বিদ্বেষ কেবল নির্দিষ্ট উলামায়ে কেরামের সাথে নয়; বরং তাদের বিদ্বেষ সরাসরি ইলমে দীন ও ইলমে দীনের সকল ধারক-বাহকদের সাথে। এই শ্রেণীটির ঈমান চলে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কারণ কোন মুসলমান যদি ঢালাওভাবে ইলমে দীনের ধারক-বাহক হওয়ার কারণে উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, আর মনে করে যে, নিজেরা আলেম না হয়ে ভালো কাজ করেছে এবং দীনের জন্য আলেমদের কোন প্রয়োজন নেই, আলেমরা দীনের মধ্যে শুধু বিভেদ ছড়ায় ইত্যাদি, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং বিবাহ ভেঙ্গে যায়। সুতরাং (আল্লাহ না করুন) কারো ব্যাপারে যদি এমনটা নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে এমন লোকের সাথে লেন-দেন, উঠা-বসা করাসহ যাবতীয় বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে এবং তার স্ত্রীর জন্যে তার সঙ্গে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। কারণ স্বামীর কুফুরীর কারণে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে গেছে। কাজেই তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। পরে তওবা করলে এবং ঈমান গ্রহণ করলে আবার নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

আরেক শ্রেণীর এতায়াতী, যারা সা'দ সাহেবের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যগুলোকেও সঠিক মনে করে এবং সা'দ সাহেবের কুরআন-হাদীস পরিপন্থী বয়ানের বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তাকে ভুল আখ্যায়িত করে এবং ভুল ধরে দেয়া উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করে, তাদেরকে গালমন্দ করে। এ সকল এতায়াতী ঈমানহারা না হলেও চরম পর্যায়ের গোমরাহ ও ফাসেক। তাদের পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। এমন লোকের নিকট দীনদার পরিবারের মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়া উচিত নয়। পারতপক্ষে তাদের সাথে লেন-দেন না করা এবং উঠা-বসাও পরিহার করা। দেখা-সাক্ষাৎ হলে শুধু সালাম ও জবাবে ক্ষান্ত করতে হবে।

এতায়াতীদের আরেকটা শ্রেণী আছে, যারা মূর্খতার কারণে চলমান এ ফেতনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না, শুধু লোক দেখা-দেখি বা পূর্ব সম্পর্কের কারণে এতায়াতীদের সাথে চলা-ফেরা করে। এতায়াতীরা তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের সাথে রেখেছে। বাস্তবে উলামায়ে কেরামের প্রতি তাদের বিদ্বেষ নেই। এ বিভ্রান্তিতে মূলত তারা দোষী নয়; বরং দোষী হলো তাদের এতায়াতী নেতারা। এ শ্রেণীর এতায়াতীদের দোষ হলো তাদের অতি সরলতা ও মূর্খতা।

এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে করণীয় হবে, প্রথমে তাদেরকে বিনয় ও নম্রতার সাথে বিষয়গুলো খুলে খুলে বুঝানো যে, মাওলানা সা'দ সাহেব ভুলের উপর আছেন, এ ধরণের লোকের অনুসরণ জায়েয নেই। পক্ষান্তরে উলামায়ে কেরাম হকের উপর আছেন। উলামায়ে কেরাম মিথ্যা কথা বলছেন না; বরং মানুষকে গোমরাহী থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা হিসেবে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতেই তার সমস্যাগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছেন। এটা গীবত নয়; বরং খায়েরখাহী তথা হিতকামনা, যা আলেমদের ঈমানী দায়িত্ব। যারা আলেমদের কথাকে মিথ্যা বলছে, মূলত তারাই মিথ্যুক। যারা আলেমদের কথাকে গীবত বলছে তারা চরম পর্যায়ের জাহেল। তাদের সাথে চললে গোমরাহী অবধারিত।

বুঝানোর পর যদি তাদের তওবা করে ফিরে আসার আশা থাকে, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে লেন-দেন, উঠা-বসা করতে সমস্যা নেই। বরং উঠা-বসা বহাল রেখে তাদেরকে সকল বিষয়ে হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে পরামর্শ নিয়ে চলার দাওয়াত দিতে হবে। এভাবে কিছুদিন চলার পরেও যদি তারা তওবা করে এতায়াতীদের সঙ্গ ছেড়ে আসতে রাজী না হয়, তাহলে বুঝতে হবে এরাও পূর্ববর্তী দুই শ্রেণীর কোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে তাদের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা যাবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১০০, ৬৫০২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৭৩, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২৭৫৫, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৪২১, বযলুল মাজহুদ ফী হাল্লি সুনানি আবী দাউদ ১৩/৩১৯, মিরকাতুল মাফাতীহ ৮/৩১৪৬, শরহুল ফিকহিল আকবার; পৃষ্ঠা ১৭৩, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩/১৮৮, মাজমাউল আনহুর ১/৬৯৫, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/২৪৩)

**মুহাম্মাদ যুবায়ের**
**আমতলা বাজার, মিরপুর-১, ঢাকা**

**৩৮০ প্রশ্ন :** মুহতারাম, আমি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি গ্রুপ অফ কোম্পানি। আর প্রত্যেকটি Group of compay অনেকগুলো অঙ্গপ্রতিষ্ঠান মিলে গঠিত হয়। আমাদের কোম্পানিটিও অনেকগুলো অঙ্গপ্রতিষ্ঠান মিলে গঠিত। যেমন- যমুনা গ্রুপ, আরও অনেক। তো আমাদের কোম্পানির লক্ষ্য ও ভিশন হচ্ছে Helth And Welth তথা মানুষের সুস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দেয়া। সেমতে আমরা মানুষের সুস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দেয়ার লক্ষ্যে এমন কিছু World Soliution oriented Product নিয়ে কাজ করে থাকি, যেগুলো Helth Organaization তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তার মধ্যে অন্যতম চমৎকার একটি প্রোডাক্ট হচ্ছে

Sankom। এটি একটি ভোজনযোগ্য আঁশ। এটি সুইজারল্যান্ডের তৈরী। সুইজারল্যান্ডের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গেস্টলজিস্ট ডা. মাজুরিক তৈরী করেছেন। এটি মূলত চারটি ফলের নির্যাস দ্বারা তৈরী– স্ট্রবেরি, চেরি, গ্রেপফ্রুট, পীচ। এটি শরীর থেকে ট্রনিক জাতীয় বর্জ্য দূর করে দেয়। দেহের চর্বির স্বাভাবিক স্তর বজায় রাখে। হজম প্রক্রিয়াকে সঠিক রাখে। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে। অন্ত্রের কার্যক্রমে উন্নয়ন ঘটায়। কোষ্ঠকাঠিন্য ও অজীর্নতা রোধ করে। তো আমাদের প্রত্যেকটি পণ্যই সুস্বাস্থ্যের জন্য বলতে গেলে আবশ্যকীয়। যাই হোক, সবগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; অনুমানের জন্য একটি উল্লেখ করা হলো।

আমাদের ইনকামের মূল সিস্টেম হলো, আমি যখন কোম্পানিতে কাজ শুরু করব, তখন আমাকে তাদের স্বাস্থ্যসম্মত যে কোনো একটি প্রোডাক্ট ক্রয় করতে হবে। তাহলেই আমি তাদের এই কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ পাব। প্রোডাক্টটি কেনার কারণ হলো, যদি আমি প্রোডাক্টটি ব্যবহার করি তাহলেই তো আরেকজনকে Confidence এর সাথে বলতে পারব যে, এই প্রোডাক্টটি ভালো; এটি আপনিও ব্যবহার করতে পারেন। এটা হলো প্রোডাক্ট কেনার অন্যতম একটি কারণ। আরেকটি কারণ হলো, আমাদের যে প্রচলিত তাবলীগ আছে সেখানে একটি নিয়ম আছে যে, কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় যেতে চায় তাহলে তার থেকে আগে উসুল বা টাকা নিয়ে নেয়া হয়। কারণ, এতে তার একটা গুরুত্ব থাকে যে, আমি তো টাকা দিয়েছি, সুতরাং আমাকে যেতে হবে। ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের এই প্রোডাক্ট কেনার কারণ এটাই। যাতে করে তার একটা গুরুত্ব থাকে যে, আমি তো টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট নিয়েছি, এখন যদি আমি কাজ না করি তাহলে তো আমার টাকাগুলো লস হবে। সেজন্য তার একটা গুরুত্ব আসে এবং সে কাজ করে। তো যখনই আমি কোম্পানি থেকে একটি পণ্য ক্রয় করলাম তখন সাথে সাথে কোম্পানি আমাকে একটি আইডি দিয়ে দিচ্ছে। এই আইডি দিয়েই মূলত আমরা ইনকামের সুযোগ পাই। এই আইডিটা একটা Online (অনলাইন) আইডি।

এই আইডিটা দেয়া হয় হিসাব ঠিক রাখার জন্য। আমি এবং আমার কর্মচারীরা কয়টা পণ্য বিক্রি করলাম সেটার হিসাব আমার আইডিতে আমি দেখতে পাব। তো যখন আমি পণ্যটি ব্যবহার করে উপকৃত হলাম, তখন অবশ্যই আমি আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে শেয়ার করবো।

এদের মধ্য থেকে যখন কেউ পণ্যের উপকারের কথা শুনে এখান থেকে একটা পণ্য কিনবে। তখন কোম্পানি আমাকে ৬৬০ টাকা দিবে। এই কারণে যে, যেহেতু সে আমার তথ্যের মাধ্যমে একটি পণ্য ক্রয় করল। এভাবে আরেকজন একটি পণ্য কিনল, তাহলে আমি আরো ৬৬০ টাকা পাব।

এই দু'টি পণ্য বিক্রি বাবদ আমি মোট ১৩২০ টাকা পাব। সাথে আরো একটি মজার ইনকাম পাচ্ছি। সেটা হলো, যখন আমার দু'টি পণ্য বিক্রি হলো তখন আমার একটি Mathing তথা জোড়া হলো। এই জোড়া বাবদ কোম্পানি আমাকে আরো ৪৪০ টাকা বোনাস হিসেবে দিচ্ছে। তাহলে আমার মোট ইনকাম দাঁড়াচ্ছে ১৭৬০ টাকা।

আর যখন আমি যে দুই ব্যক্তির কাছে পণ্যগুলো বিক্রি করেছি, তারা দেখবে যে, আমি দু'টি পণ্য বিক্রির মাধ্যমে ১৭৬০ টাকা ইনকাম করেছি, তখন তারা দু'জনও চাইবে ১৭৬০ টাকা ইনকাম করতে। তখন মনে করুন, তাদের একজন তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন প্রমুখ যে কোনো একজনকে তথ্য দিল যে, এই পণ্যটি খুব ভালো; আপনি এটি নিতে পারেন। তখন সেই তথ্য দেয়া বাবদ কোনো এক ব্যক্তি একটি পণ্য কিনল, তাহলে সে ৬৬০ টাকা পাবে। ঠিক তেমনিভাবে সে আরেকটি পণ্য বিক্রি বাবদ তার একটি জোড়া হলো। তো সে বাবদ সেও ৪৪০ টাকা পাবে এবং আমিও ৪৪০ টাকা পাব। এই কারণে যে, সে যেহেতু আমার মাধ্যমে শিখে এই পণ্য দু'টি বিক্রি করেছে।

এমনিভাবে যখন আমার দিকনির্দেশনায় এবং আমার কর্মীদের সহযোগিতায় অনেকগুলো পণ্য বিক্রির মাধ্যমে একটি টিম তৈরি হলো তখন আমার দায়িত্ব থাকবে উক্ত টিমকে পণ্য বিক্রির বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া এবং সামগ্রিকভাবে এটিকে পরিচালনা করা। আর এই টিমকে পণ্য বিক্রয়ের দিকনির্দেশনা দেয়ার দ্বারা যে পণ্যগুলো বিক্রি হবে তারও একটি লাভ আমি পাব।

এ রকম টিম বা পণ্য বিক্রি হতে হতে যখন ২৫+২৫=৫০টি পণ্য বিক্রি হবে তখন আমি কোম্পানির প্রথম অফিসার হিসেবে ঘোষিত হব এবং কোম্পানি আমাকে বাংলাদেশের একটি ভালো পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণের সুযোগ দিবে। তদ্রূপ যখন ১৫০+১৫০=৩০০টি পণ্য বিক্রি হবে তখন আমি কোম্পানির দ্বিতীয় অফিসার হিসেবে ঘোষিত হব। তখন আমাকে কোম্পানি ফ্রীতে বিদেশ ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসবে। এমনিভাবে যখন ৬০০+৬০০=১২০০টি পণ্য বিক্রি হবে তখন আমি তৃতীয় অফিসার ঘোষিত হব এবং তখনও কোম্পানি আমাকে সম্পূর্ণ ফ্রীতে বিদেশের যে কোনো একটি দেশে ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসবে। এভাবে যখন ১৫০০+১৫০০=৩০০০টি পণ্য বিক্রি হবে তখন আমি চতুর্থ অফিসার হব এবং কোম্পানি আমাকে ৪,০০,০০০ টাকা দিবে। এমনিভাবে যখন ২০০০+২০০০=৪০০০টি পণ্য বিক্রি হবে তখন কোম্পানি আমাকে ৮,০০,০০০ টাকা দিবে। যখন ৪০০০+৪০০০=৮০০০টি পণ্য বিক্রি হবে তখন কোম্পানি আমাকে একটি গাড়ি দিবে। এমনিভাবে যখন ৮০০০+৮০০০=১৬০০০টি পণ্য বিক্রি হবে তখন কোম্পানি আমাকে একটি Luxery Flat (ফ্ল্যাট) দিবে।

জানার বিষয় হলো, এই সিস্টেমে আমাদের কোম্পানিতে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করা ও পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করে জীবনচলার পথ সুগম করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ। তবে প্রশ্নে বর্ণিত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের এই সিস্টেমের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডগুলোতে শরীয়ত নিষিদ্ধ অনেকগুলো কারণ (যেমন- ভাড়া চুক্তির মধ্যে ক্রয় চুক্তির শর্ত করা, সূদের সাদৃশ্য, ধোঁকা, শ্রমহীন বিনিময়, বিনিময়হীন শ্রম, জুয়া ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকার কারণে এই কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। তাই কোনো মুসলমানের জন্য এই কোম্পানিতে জড়িত হওয়া এবং এ সিস্টেমে ব্যবসা করা জায়েয হবে না। এ পদ্ধতিতে ব্যবসায় উপার্জিত অর্থও হালাল নয়। মাসআলা না জেনে কেউ এর সাথে যুক্ত হয়ে আয় করে থাকলে তাকে তওবা করতে হবে এবং উপার্জিত অর্থ সওয়াবের নিয়ত না করে দান করে দিতে হবে। (সূরা নিসা- ২৯, বাদায়িউস সানায়ে ৫/১৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১/১৫২, ২/৬৩, মা'আলিমুস সুনান ৩/১৪৬, ফাতাওয়া শামী ৬/৬৪, কাওয়াইদুল ফিকহ; পৃষ্ঠা ৫৭, ৩৯৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩/৮৩, আহকামুল কুরআন লিল-জাস্‌সাস ২/২১৬, ৫৮২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬/৪৪১)